Issue cover not available

Vol. 13 | No. 2 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর (সমাজ সংস্কারক-প্রাবন্ধিক)

Volume	13
Issue	2
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফরিদা প্রধান
Published online	December 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i2.2
Pages	41-92
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

(সমাজ সংস্কারক-প্রাবন্ধিক)

ফরিদা প্রধান

উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হ'তে চলেছিল জাতীয় জীবনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে, ভাবদ্বন্দ্ব মুখর সেই পরিবেশে অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে আবির্ভাব হয় এই যুগ-পুরুষদ্বয়ের ।

ইংরেজ-শাসনাধীনে য়ুরোপীয় জীবনযাত্রা ধ্যানধারণা, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল বাঙালী সমাজে। মধ্যযুগের জড় নির্জীব, অচেতন বাঙালী চঞ্চল গতিশীল পাশ্চাত্যের প্রবল ধাক্কায় জেগে উঠল। ইংরেজ শাসনে ও শিক্ষায় এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হল সমাজ ও ব্যক্তি-মানসে। সুপ্ত প্রাণে জাগল নব জাগরণের সাড়া। প্রাচীন ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের সঙ্গে নতুন ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের দ্বন্দ্বে দেখা দিল এক বিরাট আন্দোলন ও আলোড়ন। যুগ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল আর তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলেন সে যুগের বুদ্ধিমান ও শক্তিমান পুরুষেরা।

একদিকে বাঙালী কৃষক সমাজে ইংরেজের কঠিন শাসন অন্যদিকে তাদের বয়ে আনা মুক্ত বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ মানুষ। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকট ও সম্ভাবনায় পূর্ণ সে যুগ। এমনি সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-সমন্বয় সাধনের পথ প্রদর্শক হয়ে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে রামমোহনের আবির্ভাব। রামমোহনের উদ্‌যোগে তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙালী নিজের ধর্ম ও সমাজের কুসংস্কার সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হল। ইংরেজী শিক্ষা দানের জন্য স্থাপিত হল হিন্দু কলেজ। ইংরেজের ভালোর সঙ্গে মন্দকেও নির্বিচারে গ্রহণ করতে লাগলো ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী তরুণের দল। নবাগতের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিক সমস্ত কিছুতে ঘৃণা ও সন্দেহ—তারা প্রগতি-শীল, সংস্কার মুক্ত, তাদের মনে নবযুগের দিব্যদাহ, তারা 'ইয়ংবেঙ্গল'; অন্যদিকে রক্ষণশীল প্রাচীন পন্থী প্রবীণেরা, যাদের মধ্যে প্রাচীনকে, তার সমস্ত ভালোমন্দকে ধরে রাখবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এই বৈপরীত্যের মাঝে, নবজাগৃতির এই বিশাল পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বাঙালীকে পথ দেখিয়েছে।

তাঁদের এই আবির্ভাব সম্ভব হত না যদি তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে উজ্জীবিত না করতেন। কিন্তু তা বলে একথা ভাবা ভুল হবে যে, তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সৃষ্টি। যুগের আবহাওয়াকে, ইংরেজী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেও তাঁরা খাঁটী বাঙালী। সমগ্র বাঙালী জাতির সত্তাকে তাঁরা নিজেদের সত্তার মধ্যে অনুভব করে-ছিলেন, বাঙালীয়ানার অনুভূতি তাঁদের মনুষ্যত্ববোধের তীব্রতায় পরিস্ফুট হয়েছিল অতি সহজেই। এর বাহ্যিক প্রকাশ রামমোহনের বেদান্ত আশ্রয়ে আর বিদ্যাসাগরের চটি ও চাদরে। কিন্তু তাঁদের অন্তরের বাঙালীত্বের প্রকাশ তাঁদের কর্মে। ভাব ও মানসজীবনে ইংরেজের বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রভাব ছিল যথেষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত বাঙালী হিন্দু সমাজ। বাঙালীর উন্নতির জন্য বাঙালী সমাজে মুক্তির হাওয়া বইয়ে দেবার জন্যই তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ব্যায়িত হয়েছে।

সংস্কৃত বিদ্যাতেই তাঁদের জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, পরবর্তীকালে নিজেদের চেষ্টায়, প্রাণের তাগিদে ইংরেজী বিদ্যা আয়ত্ব করেন। দেশীয় ক্লাসিকাল বিদ্যায় গভীর জ্ঞানের ফলে ইংরেজী বিদ্যার ভালোকে তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশ ও বিদেশের মঙ্গলকে, সুন্দরকে নিজেদের মধ্যে একত্রিত করতে পেরেছিলেন বলেই না তাঁরা যুগপুরুষ, আদর্শ মানুষ।

কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা শুরু করবার পূর্বে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর দু'জনই ছিলেন সমাজ সংস্কারক। দেশবাসীর অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ব্যথিত হয়েই প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে তাঁরা তাঁদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন।

রামমোহনের এই সংস্কার চেতনার উন্মেষ হয় জীবনের অর্ধেক সময় কেটে যাবার পর। হুগলী জেলার রাধানগরে নবাবী আমলের পদস্থ রাজকর্মচারীর ঘরে জন্মেছিলেন তিনি (১৭৭৪ খৃঃ)। পরিবারে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়া ছিল। পাঠশালায় কিছুটা পড়াশোনা করে তিনি প্রথমে পাটনা ও পরে কাশীতে যান আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য। এরপর বাবার অনুগত ছেলে হয়ে, বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করেন এবং চাকরী, ব্যবসা ও নিজস্ব সম্পত্তি ক্রয় করেন।

বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। এরই মাঝে চাকুরী ও ব্যবসা উপলক্ষে রংপুরে আসেন এবং দীর্ঘ পাঁচ বৎসর হরিহরানন্দ নাথ তীর্থ-স্বামীর সঙ্গে বাস করেন; এরই ফলশ্রুতি হিন্দু শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান। রামমোহনের ধর্মজীবন গঠনে যে ডিগবীর প্রবল প্রভাব তার সঙ্গেও এখানেই তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। ডিগবীর সহায়তায় ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি এবং ধর্মের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে সক্ষম হন। বাইবেলের কতক উপদেশ তাঁর জীবনে যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। পাট-নায় আরবী ফার্সী শিক্ষাকালে একদিকে কোরান ও ইসলামের একেশ্বর

বাদে অন্যদিকে ইউক্লিড ও এ্যারিষ্টটলের যুক্তিবাদে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। এই রংপুরেই মুসলমান মৌলবীদের সঙ্গে আলোচনায় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের প্রসার ঘটে। সুফী সাহিত্যে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ কিন্তু মোতাজেলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ থেকেই তিনি প্রধানতঃ তাঁর মনের খোরাক সংগ্রহ করেন। সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে কোরানের শিক্ষা তাঁর ধর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছিল গভীর ভাবে। সম্ভবত এরই ফলে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতায় তিনি আস্থা হারান। এ ছাড়া পাটনা থেকে ফেরার পর পিতার সঙ্গে সন্তানদের জন্যই হোক আর বিশ্বের ধর্ম সম্বন্ধে জানবার জন্য হোক তিনি ১৫ বছর বয়সে তিব্বত যাত্রা করেন। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতীয়দের ধর্মজ্ঞান ও পূজাপদ্ধতির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এমনি ভাবে বিভিন্ন ধর্মের ও ধর্মাবলম্বী মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি মন ও মানসজীবনের দিক থেকে প্রবেশ করছিলেন নতুন এক জগতে। প্রচলিত হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর মনোবিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়া-হ্‌হিদীন' গ্রন্থে (১৮০৩-৪)।

কিন্তু রামমোহন শুধু ধর্ম জিজ্ঞাসায় দিন কাটাননি, ধর্ম-জিজ্ঞাসার সাথে অর্থজিজ্ঞাসা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসারও চর্চা করেছেন। বিত্তবান ও জ্ঞানবান রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জুলাই কলকাতায় এলেন স্থায়ীভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্য। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনি পুরোমাত্রায় বিষয়ী লোক ছিলেন। কলকাতায় এসে সুখ ঐশ্বর্যে তিনি বিলাসী জীবন যাপন করেন—কিন্তু সে যুগের বিষয়ী সম্ভ্রান্ত লোকদের মত তাঁর বাড়ীতে বাইজীর নাচ হত, তিনি মুসলমানী জোব্বা পরতেন। কিন্তু অন্যদিকে এই কলকাতা অবস্থানের কালই (১৮১৪-১৮৩১) তাঁর কর্মজীবনের চরম বিকাশের কাল। ইংরেজ শাসনে গ্রামকেন্দ্রিক বাংলা সমাজ নগরকেন্দ্রিক হয়েছে—ফলে কলকাতা হয়েছে বাঙালীর

নবজাগরণের পীঠস্থান। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রস্থল কলকাতাকে কেন্দ্র করেই আধুনিক যুগে বাংলা দেশে রিফর্মেশনের তথা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। এখানে এসে রামমোহন আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত ভাবে সমাজ ধর্ম ও মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন। ইংরেজের সাহচর্যে, ইংরেজী বিদ্যার দ্বারা তিনি গভীর ভাবে প্রবুদ্ধ হন এবং যুগধর্মের প্রেরণায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও আচার পরায়ণতা সম্বন্ধে যে একটা ক্ষোভ, একটা সংশয় তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল তা আরও দৃঢ় ও প্রবল হতে থাকে। অবশ্য শুধু রামমোহনই নন উনিশ শতকের প্রথম থেকেই মিশনারীদের প্রচার কার্যের ফলে অনেক বাঙালীর মনে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের পূর্বে এমন প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও সমলোচনা কেউ করতে সাহসী হননি। আসলে রামমোহন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা ও সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে দেখলেন বিশ্বের সমস্ত মানুষ এক স্রষ্টা ও বিধাতাকেই উপাসনা করছে—কিন্তু কি তাঁর স্বরূপ লক্ষণ, কোন পথে কোন উপায়ে উপাসনা করলে তাঁর সঙ্গ পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে তারা এক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না ফলে শুরু হয়েছে মানুষে মানুষে প্রভেদ।' এসব দেখে তিনি জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করলেন—নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই সবচেয়ে মহৎ উপাসনা। হিন্দুরই বেদান্ত গ্রন্থের আশ্রয়ে তিনি প্রমাণ করলেন সে কথা। আত্মীয় সভা স্থাপন (১৮১৫) ও বেদান্ত গ্রন্থ অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি ধর্ম সংস্কারের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নামলেন। ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা, সংস্কারমুক্ত জীবন যাপন এবং তাদের মুখে সতত হিন্দু ধর্মের আচার পরায়ণতা, নিষ্ঠুর সামাজিক বিধান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি—ইত্যাদির সমালোচনা শুনে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ জীবনের উপর তাঁর বিরূপতা সম্ভবতঃ বৃদ্ধি পায়।' তাছাড়া তাঁর মনোজীবন যে বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করেছে তা মনে রাখলে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিদ্রোহ খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে হয়।

তিনি প্রথমে সংস্কৃত পড়েছিলেন পরে আরবী ফারসী। একদিকে বেদ বেদান্ত অন্যদিকে কোরান ও পরবর্তীকালে বাইবেল। মোতাজেলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ, মুত্তবাহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদ ও সুফী সাহিত্যের উদারতা—কোথাও বিভ্রান্ত হবার সুযোগ নেই। ব্রাহ্মণ রামমোহন বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে—একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হলেন। বেদান্তের মায়াবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি ব্রাহ্ম, জগৎ, ও জীবের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন।'

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে তিনি জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেননি। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়ে ও পরধর্মে আকৃষ্ট হয়েও তার প্রভাব স্বীকার না করে তিনি খুঁজে খুঁজে হিন্দুর বেদান্ত গ্রন্থ অবলম্বন করে নিজের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন। যুগধর্মের পুরোধা হয়েও তিনি দেশধর্মের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি—এমনকি তাঁর কালের হিন্দু দেওয়ান মুৎসুদ্দির সমস্ত বৈষয়িক চাতুর্য ও সম্ভ্রান্ত বিলাসে তার কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিলনা। প্রসঙ্গত বলা যায়, শাস্ত্র অবলম্বন করে সংস্কার ক্ষেত্রে নামলেও রামমোহন তত্ত্ব ভক্ত, ভক্ত সাধক বা কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচারক ছিলেন না। প্রতিপক্ষের উত্তর দেবার জন্যই শাস্ত্রের ডাক পড়েছে। শাস্ত্রীয় যুক্তিকে তিনি নিজের অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছেন। নইলে কোন কিছুকে অন্ধ ভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা তাঁর মত যুক্তিবাদী লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু শুধু যুক্তি নয় তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম প্রতিষ্টার মূলে আরও বিভিন্ন কারণ কাজ করেছে। প্রধানতঃ হিন্দু ধর্মকে পরিমার্জনা করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা, কারণ তিনি বুঝেছিলেন ব্যবহারিক রাজনৈতিক সুবিধা ও উন্নতির জন্যও হিন্দু সমাজকে একেশ্বরবাদে দীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ ধর্মচেতন মন নিয়ে পারিত্রিক মুক্তিলাভের প্রেরণায় নয় বাঙালীর নতুন জীবন গঠনের প্রয়োজনে, সমসাময়িক সামাজিক তাগিদে তিনি ধর্ম সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। জীবন ও কর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও চর্চা হিসাবে ধর্মকে কখনও

দেখেননি—ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সাধনই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। অন্যকথায় বাস্তব প্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে শাস্ত্র বিধি ও সমাজের আচারকে অমান্য করে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাতায়ন থেকে তিনি ধর্মকে বিচার করেছেন। তাঁর এই মানব হিত ব্রত ও যুক্তিবাদ উনিশ শতকের ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে বিশ্ব বিবর্তনের ধারায় আমাদের দেশের মানুষ উপলব্ধি করে। উল্লেখ্য যে ধর্ম নিয়েই আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের সমৃদ্ধি। রাষ্ট্র, সমাজ বা মানুষ নয়—ধর্মই ছিল সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ধর্ম নিয়ে আলোচনা বা ধর্ম সাহিত্য আদি-কাল থেকে চলে আসছে। রামমোহন এর কিছু ব্যতিক্রম নন। কিন্তু পুরনো ঐতিহ্যে লালিত হয়েও ধর্মালোচনায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন পথ দেখালেন। এখানে ধর্ম মুখ্য নয়, মানুষ মুখ্য, ধর্মের জন্য একটি যুক্তি সঙ্গত ধর্ম তিনি রচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম মানুষকে তার পরলৌকিক কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ করেনা, সংসারের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে, এই জীবনকে তার ধর্ম অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছে।

নতুন ধর্মমত প্রচার করতে গিয়ে রামমোহন একাধারে দেশী রক্ষনশীল পণ্ডিত সমাজ ও গোড়া বিদেশী পাদরীদের সঙ্গে মসী ও বাকযুদ্ধে অব-তীর্ণ হন। একদিকে হিন্দু ধর্মের অচলায়তন ভাঙতে অন্যদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম-যাজকদের অযথা অন্যায় কটুক্তি থেকে হিন্দু ধর্মকে বাঁচাতে এবং তাদের একেশ্বর বাদে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি অস্থির পদক্ষেপে সর্বত্র সর্বশাস্ত্রে বিচরণ করেছেন। যে সত্য মুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। সমস্ত প্রকার অলৌকিকতার কুহেলিকা থেকে তিনি ধর্মকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই খৃষ্টান ধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েও তিনি এর ত্রিতত্ত্ববাদকে আক্রমণ করেন। বাইবেলের যে সব উপদেশ মানুষের নৈতিক জীবনে সাহায্য করে চরিত্র মন স্বচ্ছ হয় সে সবকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং খৃষ্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদ যিশুর রক্তে পাপীর পরি-

ত্রাণ ইত্যাদি জটিল তত্ত্ব বাদ দিয়ে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Precepts of Jesus—the guide to peace and Happines নামে বাইবেলের একটি সংকলন প্রকাশ করেন।

এই সংকলন নিয়ে পাদরীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে। তাদের মতে ঐসব পরিত্যাক্ত তত্ত্বই খৃষ্টান ধর্মের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন তাদের মত খণ্ডন করবার জন্য ক্রমান্বয়ে আরও তিনটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি বলেন, 'যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। যিশুখৃষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিলনা। ঈশ্বর এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর।' এখানে তাঁর যুক্তিবাদী মনের স্বচ্ছ ও সাবলীল প্রকাশ। মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক মন নব-যুগে মানব কেন্দ্রিক হয়েছে—রামমোহন সেই মানবমুখিতা বা Humanism এর প্রকাশ, কি ধর্ম সংস্কারে, কি সমাজ সংস্কারে। তাই দেখি বৈষ্ণব সন্তান হয়েও তাঁর যুক্তিবাদী মন বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাসকে স্বীকার করেনি। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থে (১৮১৮) তিনি বৈষ্ণব ধর্মকে নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করেছেন, গোপীনীদের প্রতি কৃষ্ণের নির্লজ্জ ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছেন—"বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন সূত্রের অর্থ সকল সর্বলোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন।' অন্যদিকে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন কিন্তু কোথাও এর উল্লেখ করেননি। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হয়, বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ মুক্তির সাধনা—যা ইহ জগতকে পাশে সরিয়ে পরলোকের সুখ খোঁজে, জীবনের সুখ ও আনন্দকে মূল্য দেয়না—তা রামমোহনের মত ভোগী পুরুষের মনে রেখা-পাত করেনি। সুখে দুঃখে জড়ানো এই সংসারে বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদে মানুষের মনে শান্তি দিতে সক্ষম হয় না। উপরন্তু রামমোহনের মনে ইহ-

লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণই সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর মনকে নিরাসক্ত রেখেছে।

কিন্তু তান্ত্রিক উপাসনাকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন, সম্ভবতঃ তান্ত্রিক তন্ত্রসাধক হরিহরানন্দ নাথ তীর্থস্বামীর নিকট সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সময়ে তাঁর সাহচর্যে তিনি তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট হন।'
তন্ত্র সাধনার স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, 'যেহেতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা রহিত ব্যক্তিদের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।' কিন্তু 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা'ই তন্ত্রোপাসনার একমাত্র কারণ নয়। তন্ত্র সাধনার সংস্কার ও শাস্ত্রবিধি মুক্তির প্রবণতা ছিল, তন্ত্র সাধকগণ বর্ণ বৈষম্য মানতেন না। স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, এক কথায় সমস্ত কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন তারা। আর সেজন্যই রামমোহনকে এই ধর্ম আকৃষ্ট করে।'

সমস্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হবেনা রামমোহনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মের মূলে রয়েছে 'রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখ শান্তি' লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজের নাগরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি, তাঁদের বুদ্ধিবাদ, যুক্তিবাদ ও মানবপ্রেমের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছিল বলে তিনি ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই—কিন্তু এ সবের পেছনে অন্তঃসলিলা রূপে প্রবাহিত রয়েছে ব্যক্তিগত বৈষয়িক সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজ রাজত্বে এই ধনতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছিল প্রচুর।' অন্ততঃ এই সুবিধা লাভের জন্যও যে হিন্দু ধর্মে পরিবর্তন প্রয়োজন একথা বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। 'It is, I think necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.'

একদিকে স্বার্থপরতা অন্যদিকে মানবপ্রেম—এ দুয়ের আশ্চর্য ও সার্থক সমন্বয় ঘটেছে রামমোহন চরিত্রে।

সংস্কার মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে মানুষ যাতে চিন্তা করতে পারে, দেশীয় সাধনার মূল্যবোধকে বিসর্জন না দিয়ে বাইরের কল্যাণকে যেন তারা উদার-ভাবে গ্রহণ করতে পারে-এসবই তাঁর ঐকান্তিক কামনার বস্তু। একেশ্বর বাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববাসীকে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন, তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বিশ্বজনীন করতে চেয়েছিলেন।' ভারতবাসীকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বসীমায় পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এসব চাওয়ার মধ্যে স্বার্থের চিন্তা ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু মানবতাবোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তি নিষ্ঠা ইত্যাদিও কম ছিল না। তার এই মহৎ উদ্দেশ্য সে যুগের কিছু সংখ্যক লোক বুঝলেও সবাইতো আর বুঝতে পারেনি। তাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ তাঁর প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা শুধু তাঁর মতেরই বিরোধিতা করলেন না, ব্যক্তিগত জীবনেও আক্রমণ চালালেন। নিন্দা, তিরস্কার, বিদ্রূপ অজস্র ধারায় তাঁর উপর বর্ষিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে তিনি সরে দাঁড়াননি, অবিচল ও নির্বিকার চিত্তে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করেছেন।' দৃঢ়-বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করেছেন 'শাস্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুক্তিবাদের'। বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসারের (১৮১৫) পর তিনি ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮) কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০) গুরুপাদুকা (১৮২৩) চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২) পাদরী ও শিষ্য সম্বাদ (১৮২১) প্রার্থনা পত্র (১৮২৩) ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮) অনুষ্ঠান (১৯২৯) ইত্যাদি গ্রন্থে ধর্ম ও তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করেন। পরমত খণ্ডন ও নিজমত প্রতিষ্ঠাই এগুলির মূল উদ্দেশ্য। প্রায় প্রতিটি পুস্তিকাই ব্যক্তি বিশেষের প্রশ্নের উত্তরে বা প্রতিবাদে লেখা। কোথাও বা কথপোকথনের মাধ্যমে নিজ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। চিন্তার প্রতি পদক্ষেপে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে অপর পক্ষের যুক্তিগুলি শুনেছেন, বিচার করেছেন এবং সে সবের মর্ম বুঝে তাদের প্রতি সুবিচার করে ধীর মন্থর

গতিতে তাঁর নিজের চিন্তার রথ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কোথাও অস্পষ্টতা নেই, সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কে ফাঁক নেই।

পাদ্রীগণের খ্রীস্টধর্ম প্রচারে হিন্দু সমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়—তারই ফল স্বরূপ হিন্দুদের মধ্যে প্রথমে প্রবল প্রতিক্রিয়া ও পরে শিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার শুরু হয়েছিল। ভাব ও চিন্তাধারার এই আন্দোলন জাতিকে মোক্ষ লাভের পথে নিয়ে যায়নি, জাতির জীবনকে নতুন করে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে প্রাণে জাগিয়েছে জাতীয়তাবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। প্রচলিত ধর্মকে যুগোপযোগী রূপ দিয়ে জাতির সমাজ ও ভাবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই ভাব ও চিন্তা ধারার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।' রামমোহন ছিলেন সবার সামনে। প্রথম ঝড়ের অস্থির মত্ততা তাঁর উপর দিয়েই বয়ে গেছে। তিনি হিন্দু ধর্মকে প্রবল ভাবে আঘাত হানলেন—এবং বাঁচালেন ধ্বংসের মুখ থেকে। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে 'আত্মীয় সভা'র পর একে একে প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮২১ এ 'ইউনিটেরিয়ান কমিটি' ও পরে ১৮২৮ সনে 'ব্রাহ্ম সমাজ'। প্রকাশ করলেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২২) সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১) ও সীরাৎ-উল আখবার (১৮২২) পত্রিকা। লেখা ও তর্ক বিতর্ক চল্‌ল ইংরাজী ফারসী ও বাংলায়। জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করতে প্রতিষ্ঠা করলেন স্কুল।'

ধর্ম ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আধুনিক-পূর্ব বাঙ্গালীর সমাজ ও সভ্যতা ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অর্থের প্রাচুর্যেও পরিবর্তিত হত না—অর্থের কৌলীন্যের বদলে ছিল রক্তের কৌলীন্য। ইংরেজের হাতে পড়ে এই সভ্যতা নবরূপ ধারন করল। সমাজ ছিল অনাচার ও অবিচারে সমাচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল সবার উপরে। ফলে ব্রাহ্মণ পরিবারেই এই অনাচার সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার অভিঘাতে প্রাচীন সমাজের কাঠামো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়—জাতের কৌলীন্য ও রক্ত সম্পর্কের আভিজাত্য অর্থের কাছে পরাজিত হল।

ব্রাহ্মণগণ নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদে প্রবেশ করলো বদ্ধ আচারে আচ্ছন্ন গলিতে। সতীদাহ, বাল্য-বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি দুর্নীতি চলছিল ব্যাপক ভাবে। বৃটিশ ও নবাবী আমলের সন্ধিক্ষণে, রাষ্ট্রীয় বিশৃংঙ্খলার সুযোগে এই বিশৃংঙ্খলতার চরম বিকাশ ঘটে। এই দুর্দিনের প্রত্যুষে জন্মেছিলেন রামমোহন ও মধ্যাহ্নে বিদ্যাসাগর।'

ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তাঁরা ব্রাহ্মণ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন—একই সঙ্গে সমস্ত হিন্দু ও ব্রাহ্মণ সমাজের কল্যাণ কামনায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজের কুপ্রথাগুলি সম্বন্ধে একটা বিক্ষোভ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত রামমোহন স্বদেশবাসীর দুর্গতি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তিনি যখন নিজ ধর্মমত সাধারণ্যে প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন তখন হিন্দুদের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠে—রামোহনের যুক্তিবাদী মনে এর সাড়া জেগেছিল অনেক আগে, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে এলেন এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করতে।

সতীদাহ প্রথা নিবর্তনই রামমোহনের জীবনে শ্রেষ্ঠ কাজ। অনেকের মতে রামমোহনের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের পত্নী অলকমঞ্জরী ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে ৮ই এপ্রিল সহমৃতা হয়েছিলেন এবং এই নিষ্ঠুর কর্ম অবলোকন করে সতীদাহ প্রথা নিবারণে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।' অবশ্য এ বিষয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ তথ্যের সমন্বয়ে প্রমাণ করেছেন—'ভাইয়ের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন রংপুরে অবস্থান করছিলেন।' এ সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য। তবে গোবিন্দদাসের মাতা দুর্গাদেবী না হোক, অন্য দুই স্ত্রীর মধ্যে কোন একজনের সহমরণে যাওয়া অসম্ভব নয় এবং রংপুরে বসে সে সংবাদ শ্রবণে রামমোহনের মনে সতীদাহ বিষয়ে প্রশ্ন জাগাও অস্বাভাবিক নয়।' তবে রামমোহনের চিন্তা ও কাজের মধ্যে হৃদয়ধর্মের ভাবালুতার ও মোহাবেশের কোন ছাপ দেখিনা। তাঁর 'মননক্রিয়ার' মোহনিমুক্ত চিত্তবৃত্তি, বস্তুগ্রাহ্য চেতনা, ঐতিহাসিক সত্যদৃষ্টি

ও তীব্র তীক্ষ্ম মনীষা তাঁর যে ব্যক্তি সত্তাকে গড়ে তুলেছে তাতে বৌদির সহমরণ সংবাদ তাঁর মনে কতটুকু দাগ কেটেছিল নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। কিন্তু যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাঁর হৃদয়ের কোমল একটা অংশ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। অবশ্য সেটা চিন্তা সাপেক্ষ। তাঁর কর্মে ও চিন্তায় বা মানুষের কল্যাণ সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছার উৎপত্তি হৃদয় থেকে নয়—মস্তিষ্ক থেকে—যুক্তি ও বিচারের ঋজু ও সূক্ষ্ম পথে। এই মানবকল্যাণ বোধেরই প্রকাশ তাঁর ১৮১৮ ও ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত দুই খণ্ড সহমরণ বিষয়ক পুস্তকে। তিনি শাস্ত্রীয় বাক্যের সাহায্যে নিজে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, হিন্দুদের সহমরণ অবশ্য করণীয় নয়, কোন শাস্ত্রও তা বলেনা। বিধবার ব্রহ্মচর্য এর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ধর্ম কর্ম। তিনি বল্লেন, সতীদাহ প্রথা নারীহত্যারই নামান্তর মাত্র। কারণ এতে বলপূর্বক অনিচ্ছুক নারীদের স্বামীর চিতায় যেতে বাধ্য করা হয়। নারীর প্রতি যে অত্যাচার, অবিচার লাঞ্ছনা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে, পুরুষের হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জানান এই পুস্তিকা দুটিতে। তিনি প্রমাণ করেন সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর সহযোগিতা অপরিহার্য—তারা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, ছোট নয়। পুস্তক দুটি প্রকাশিত হবার পর হিন্দুদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁর বিরোধিতা করে, সতীদাহ প্রথা হিন্দুধর্মের অঙ্গ প্রমাণ করবার জন্য রক্ষণশীল দল রাজা রাধাকান্ত দেবকে সম্মুখে রেখে কলম ধরলেন। 'ধর্মসভা' মুখ্যতঃ সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত। রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' ও 'ব্রাহ্মসমাজে' হিন্দু সমাজে এমন কোন কুসংস্কার নেই যা নিয়ে আলোচনা হয়নি। আর অন্যপক্ষ সর্বদা তার সমালোচনা করেছে। 'সতীদাহে'র নৃশংসতাকে স্বীকার করেও এর পক্ষে যুক্তি রূপে বিরোধীদল নারীজাতির বুদ্ধিহীনতা, চঞ্চল চিত্ততা, বিশ্বাসহীনতা, ধর্মজ্ঞান শূন্যতা ইত্যাদির উল্লেখ করেন। রামমোহন প্রবল ও অকাট্য যুক্তির সাহায্যে এর প্রতিটি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। পক্ষান্তরে এসব যে পুরুষদের

ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রযোজ্য সেকথাও দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলেননি।

যেমন অস্থির অন্তঃকরণের কথা—'যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্দত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন তথাচ কহেন, যে তাদের অন্তঃকরণে স্থৈর্য্য নাই।' বিশ্বাসঘাতকতার কথা—"কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক·····।'

এমনি ভাবে যুক্তি তর্কের সাহায্যে তিনি তাদের মত খণ্ডন করে নারীর পক্ষ সমর্থন করেছেন।

তিনি নারীজাতির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন। শাস্ত্রালোচনায় ধর্মালোচনায় তাদেরও যে পূর্ণ অধিকার রয়েছে সে কথা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। নারীজাতি বুদ্ধিহীনা একথা তিনি কখনই স্বীকার বা বিশ্বাস করতেন না। তাই তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?' প্রসঙ্গত তিনি প্রাচীনযুগে যে সব নারী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের বুদ্ধিমত্তার কথা উল্লেখ করেন।

এমনি ভাবে পুস্তক লিখে সমাজের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করে, সভায় বক্তৃতা করে তিনি দেশবাসীকে সতীদাহের অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করতে সচেষ্ট হন। এবং শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছে দরবার ও দরখাস্ত করেছেন। অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।'

সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে, বেন্থাম-মিলে ভক্ত, মানবমুক্তির উপাসক রাম মোহনের মনে নারীর এই নির্যাতন যে আঘাত হানবে তা স্বাভাবিক। আর এই সামাজিক আন্দোলনটাও আকস্মিক কিছু নয়, প্রথমে মুসলিম

শাসনকর্তা ও পরে ইংরেজরা এই প্রথা নিরোধের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিছু কিছু; কাজেই বলা চলে এটি সুচিন্তিত বিস্তৃত সমাজ চেতনারই ফল। রামমোহন এবং তৎকালীন আরো কিছু সংখ্যক লোকের কণ্ঠে তা ভাষা পেয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি এই সশ্রদ্ধ মনোভাবের পেছনে রামমোহনের কোরানের শিক্ষাও যে অনেকটা কার্যকর হয়েছে তাও বোধহয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাদের প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার কোরানের একটি বিশিষ্ট শিক্ষা—হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর চরিত্রে যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

সহমরণ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন হিন্দুনারীর দায়াধিকার দাবীরও প্রশ্ন তোলেন। স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে যে নারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে, সে কথা প্রমাণ করতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি বলেন, এই প্রাপ্য থেকে বিধবারা বঞ্চিত বলেই সহমরণের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়, আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও অনিশ্চয়তার চেয়ে তারা মৃত্যুকেই অধিকতর বরণীয় মনে করে। বহু বিবাহেরও এটি একটি মূল কারণ—কারণ পুরুষদের কোন দায় দায়িত্ব নেই স্ত্রীর প্রতি। কাজেই একাধিক বিয়েতে তাদের আপত্তি বা দ্বিধাও নেই। হিন্দু সমাজের পণ-প্রথার অপকারিতাও তিনি মনে মনে উপলব্ধি করেছিলেন। জাতিভেদ প্রথার নিষ্ঠুরতা তাঁর যুক্তিবাদী মনে যে প্রবল আঘাত হেনেছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'বজ্রসূচি' গ্রন্থে।

এই উদারতা, নারী জাতির প্রতি মমত্ববোধ ও সর্বোপরি মানবতাবোধ রামমোহনের পূর্বে আর এমন দেখা যায়নি—বিদ্যাসাগর তার যোগ্য উত্তর সূরী।

সমাজ সংসারের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে নেমে রামমোহন দেখলেন সমাজের প্রতি স্তরে কুসংস্কারের কালি জমেছে প্রচুর—ফলে তা হয়ে পড়েছে গতিহীন এবং সেই জড় সমাজে প্রাণ প্রবাহের সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন—শিক্ষার ও জ্ঞানের সংকীর্ণতা দূর না করা পর্যন্ত এই সামাজিক

সমস্যার সমাধান অসম্ভব। বাংলা দেশে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তন করে এবং কুসংস্কারাদির প্রতিবাদ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবী জানিয়ে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী বন্ধুগণ বাংলা তথা ভারতের মানস-জীবনে সেই গতির সঞ্চার করেছিলেন যা জীর্ণ পুরাতনকে অস্বীকার করবে, ভাঙবে এবং নবীন আদর্শে নতুনকে সৃষ্টি করবে। বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও রামমোহন এই নীতি গ্রহণ করেন। ইংরেজ শাসনে ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মোকাবেলা করার জন্য অবিদ্যা, অশিক্ষা থেকে বাঙালী হিন্দুর মুক্তির জন্য রামমোহন সংস্কৃত শিক্ষার বদলে ইউরোপীয় বিদ্যাকে আবাহন ও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবধর্মী ব্যবহারিক শিক্ষায় দেশবাসী শিক্ষিত হয়ে অন্যান্য উন্নত জাতির মধ্যে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করুক—এটাই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। শুধু দর্শনের সূক্ষ্ম শিক্ষায় নয়, শুধু মানসিক উন্নতি নয়, জীবনের ক্ষেত্রে কার্যকর শিক্ষায়, সামাজিক উন্নতিরও তিনি পক্ষপাতি ছিলেন। তাইতো বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রবর্তক হয়েও, বেদান্তের মায়াবাদ প্রসারে তিনি প্রবল বাধা দিয়েছেন 'Nor youths be fitted to be better members of society by the vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence.' এর বদলে দেশবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন ইংরেজ সরকারের কাছে, যা বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের পরিচিত হতে সাহায্য করবে।

মুখ্যতঃ তাঁর এবং হেয়ারের উদ্যোগে ইংরাজী শিক্ষার পীঠস্থান 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়।' কিন্তু বিরোধীদলের আপত্তিতে, কলেজের মঙ্গল কামনায় তিনি তাঁর সদস্য পদ ত্যাগ করেন। লক্ষণীয় যে, রক্ষণশীল দলও ইংরাজী শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। রামমোহন এরপর নিজে (১৮২২ খৃঃ) প্রতিষ্ঠা করলেন 'অ্যাংলো-হিন্দু-স্কুল।' সেখানে ইংরাজী, বাংলার সঙ্গে ধর্ম ও নীতি শিক্ষাও দেওয়া হত। তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হ'ল জীবনকে জানাবার, জগৎকে চিনাবার। সংক্ষেপে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি।

তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের ভাবালুতা নয়, মুক্ত জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির উদ্বোধন, বেদান্ত শাস্ত্র বিলাস-ভ্রমণ নয়, গণিত পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নের রাজ্যে দৃঢ় পদচারণা। এই ইংরাজী শিক্ষাই পাশ্চাত্য জীবনের বাস্তব দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মানবতাবাদের বার্তা নিয়ে এল—বাঙালীর মধ্যে নবযুগের চেতনা পূর্ণরূপ নিল।

তিনিই প্রথম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' লিখে একই সঙ্গে তাঁর ভাষাবোধের এবং যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দেন। বইটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রকাশ করে। মূল কথা, তিনি দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, গাঢ় তমসাচ্ছন্ন আকাশে আলোর জ্যোতি বিকিরণ করতে চেয়েছিলেন—এর মধ্যে যুগের তাগিদ থাকতে পারে, তাঁর নিজের স্বার্থ থাকতে পারে কিন্তু মানুষকে মানুষ হিসাবে বাঁচতে শিখাবার প্রচেষ্টাও মিথ্যে নয়।

প্রসঙ্গত রামমোহনের রাজনৈতিক সচেতনার কথাও উল্লেখ করতে হয়। যখন ভারতে রাজনৈতিক আলোচনা বলতে কিছু ছিলনা, তখনই রামমোহন বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন ও নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলা যায়, দেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন রামমোহন। একটি সুস্থ সবল স্বাধীন জাতি গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কি রাজনৈতিক, কি সমাজিক সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই কাম্য ছিল। তাঁর কর্ম এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীর জন্য বিভিন্ন অধিকার আদায়ে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদ মনে করলেও ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল বড় লাট জন অ্যাডাম যখন প্রেস আইন জারি করলেন তখন তার প্রতিবাদে তিনি আন্দোলন করতে দ্বিধা করেননি। মুদ্রা-যন্ত্রের কণ্ঠরোধ ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এর

প্রতিবাদে তাঁর পরিচালিত পত্রিকা 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' বন্ধ করে দেন। সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট তিনি যে আবেদন পত্র পাঠান, তাতে তাঁর আত্ম-সম্মানবোধ ও দেশাত্মবোধের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়াও চার্লস গ্রে প্রবর্তিত উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন, জুরি প্রথার প্রবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি আন্দোলন চালিয়েছেন—কখনও পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে, কখনও আবেদন জানিয়ে। অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে একাত্মতাবোধ তাঁর উদার ও আন্তর্জাতিক মনোভাবের পরিচয় দেয়। তুরস্কের অত্যাচারে গ্রীসের প্রতি তিনি সহানুভূতি জানিয়েছেন, অন্যদিকে নেপল্‌স্‌বাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতায় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইংলণ্ডের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লাভের ঘটনায় ও স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে যাবার পথে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকাবাহী ফরাসী জাহাজ দেখে ভাঙ্গা পা নিয়ে গিয়ে তিনি ফরাসী জাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—তা সর্বজনবিদিত। তাঁর মনের প্রসার ও দৃঢ়তা ছিল বলেই নির্ভয়ে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন 'All mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches'। তাঁর কণ্ঠে বিশ্বজনীনতার এই গভীর সুর সে যুগের বাংলায় বিস্ময়কর।

এরপর আসে রামমোহনের ভাষা ও প্রবন্ধের কথা। সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত সাহিত্যিক ও সংস্কারক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই লেখনী ধরেছেন। রামমোহন তার ব্যতিক্রম নন। 'নিজের চিন্তাকে, সামাজিক আদর্শকে, নতুন জীবন বোধকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন। অবিচ্ছিন্ন সেই সংগ্রামে আয়ুধ ছিল এক দিকে যুক্তির শর অন্যদিকে কলম।'

সেসময় বাংলা ভাষা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আঙ্গিনায় সবেমাত্র 'হাঁটি হাঁটি পাপা' করে এগুতে শুরু করেছে—স্থির হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে

চলবার যুগ এল অনেক পরে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন—এরপর সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার ভিতর দিয়ে বাংলা গদ্য এগিয়ে চলল। কর্মক্ষেত্রে এ সময়েই রামমোহনের আবির্ভাব হয়। সে যুগের সংস্কৃত বহুল বাংলা গদ্যকে তিনি কিছুটা সহজ করতে সচেষ্ট হন। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি নিজের বক্তব্য সাধারণ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন। তাই সে ভাষা যাতে জনসাধারণের বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বেদান্ত গ্রন্থে'র ভূমিকাতেই তিনি বাংলা গদ্যের রীতি, প্রকৃতি বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বাংলা ভাষার একটা নিজস্ব কাঠামো তৈরী করতে তিনি যত্নবান হন—এবং সফল হন একটা অর্থবহ ও বক্তব্য প্রকাশে সক্ষম ভাষা প্রস্তুত করতে। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তার পরিচয় পাই 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'। কিন্তু রামমোহনের 'গদ্যরীতির মূলে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি, শাস্ত্রানুবাদ এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবিরাম শাস্ত্র দ্বন্দ্ব—এই তিনের ফলে তাঁর বাংলা ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হয়ে উঠেছে' একথা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য। বিচার বুদ্ধি ও মনন দিয়ে তিনি বাংলা গদ্যের যে রীতি ও প্রকৃতির নির্দেশ দিয়েছেন—অনুবাদ মূলক রচনায় মূল গ্রন্থকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি নিজেই তা রক্ষা করতে পারেননি। রচনার স্বাভাবিক গতি বারে বারেই ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য সেজন্য প্রথমেই তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। 'বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দসকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে এহার দোষ যাঁহারা ভাষা ও সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচার যোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই ব্যক্তিসকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন আর ভাষানুরোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জনা করিবেন।' 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও

'বেদান্ত সারে' কোথাও কোথাও তিনি সংস্কৃত শব্দগুলিকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন মাত্র। কিন্তু মৌলিক প্রবন্ধ বা প্রস্তাব গুলির সম্মুখে বিশেষ কোন আদর্শ না থাকায় তিনি স্বাধীনভাবে শব্দ ব্যবহার করেছেন —অনুবাদের তুলনায় এ ভাষা অনেক প্রাঞ্জল। 'সহমরণ বিষয়ক' পুস্তিকা দুটির ভাষা যুক্তির ভাষা, তর্কের ভাষা এবং গতিশীল ভাষা। এতে কৃত্রিমতা নেই, জড়তা নেই, বরং নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা আছে। কোথাও কোথাও তা আবার ঋজু তীক্ষ্ণধার শরের মত প্রতিপক্ষকে আঘাত করেছে। 'পাষণ্ড পীড়নে' এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। 'পাদরী ও শিষ্য সম্বাদে' একটা তরল হাস্য পরিহাসের সুর বেজে উঠেছে কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রামমোহন তাঁর 'উদার মহত্ব, লোকোত্তর প্রতিভা ও বিপুল মনীষা' দ্বারা নবজাগরিত বাংলার চিত্তকে জাগ্রত করলেও— বাংলা ভাষা বা গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর দান খুব বেশী নয়।

বাংলা গদ্যে কোন গম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তন করেন রামমোহন। তাঁর ছোট ছোট পুস্তিকা গুলির ভিতর দিয়েই বিচার বিতর্ক মূলক মৌলিক রচনার সূত্রপাত হল। ভাষায় প্রকাশ-ভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চারিত হল। বিশেষ কোন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যুক্তি তথ্য সমন্বিত লেখার চেষ্টা রামমোহনের পূর্বে যে ছিলনা তা নয়, তবে তাদের নিজ শক্তিতে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না।'

রামমোহনের চিন্তার স্বচ্ছতা, মনের দৃঢ়তা, অনাড়ম্বর পারিপাট্য, ক্ষুরধার যুক্তির ছোঁয়ায় লেখায় এসেছে গতি, ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি নিছক আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনও নিজের মত ব্যক্ত করেন নি, প্রত্যেকটির পেছনে ছিল যুক্তির দৃঢ় পটভূমি। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' পুস্তিকায় ভট্টাচার্য মসজিদ ও গীর্জায় উপাসনার সঙ্গে প্রতিমাপূজার তুলনা করেন। রামমোহন সরল যুক্তির সাহায্যে তা ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। মুসলমান ও খ্রীস্টানদের

কথায় তিনি বলেছেন যে তারা,—"মসজিদ ও গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য এই যে তাহাকে ভোগদান ও শয়ান করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহারা গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন এ সকল অর্থাৎ ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধর্মের অত্যন্ত বিপরীত হয় বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মসজিদ গিরজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।"

এ ধরণের সংযত, সুন্দর ও যুক্তি পূর্ণ কথা শুধু এখানেই নয়, সহমরণ বিষয়ক পুস্তক গুলিতেও দেখেছি, অন্যান্য পুস্তকগুলিও ব্যতিক্রম নয়। কোথাও তরল উচ্ছ্বাসের চিহ্ন নেই। বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যতটুকু প্রয়োজন মনে হয়েছে, ঠিক ততটুকুই লিখেছেন। এই পরিমিতি বোধে রয়েছে তাঁর গম্ভীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তিনি সংযম ও সুরুচি বোধকে কখনও লঙ্ঘন করেন নি। প্রতিপক্ষ তাঁর সঙ্গে যুক্তিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে অকারণে তাঁকে বিদ্রূপের বান হেনেছেন। সাধারণ সৌজন্য ও শালীনতা রক্ষারও তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ আশ্চর্য এই যে, এসবের উত্তরে সময়ে সময়ে রামমোহন হয়তো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু শ্লীলতা ও শালীনতাকে তিনি কখনই অতিক্রম করেন নি। সমসাময়িকদের তুলনায় এ স্থানেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর এই সুরুচি বোধ রচনাগুলিকে লঘু হবার সুযোগ দেয়নি। তাঁর সকল রচনায় যুক্তির নির্মম শাসন রয়েছে। আবেগের ছিঁটে-ফোঁটাও সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়না। মূল কথা হচ্ছে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে যুক্তিতর্ক, বিচারবিশ্লেষণে ও বাদানুবাদের ভিতর দিয়ে রামমোহন আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। তবে সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা Subjective essay-এর যে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন—যেখানে লেখক মনের অনাড়ম্বর, সরল ও আন্তরিক প্রকাশে পাঠক আপন জন, সহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেন। যেখানে বিষয়-

বুদ্ধির সঙ্গে থাকে হৃদয়ের যোগ—তত্ত্ব ও তথ্যের অন্তরালে থাকে ব্যক্তির ভালোলাগা মন্দলাগা—যেখানে বিষয় মুখ্য নয়—এমন প্রবন্ধ রামমোহন লেখেননি—অবশ্য এটা তাঁর কাছে আশা করাও উচিত নয়। তিনি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্য রচনা করতে বসেননি—নিজস্ব ধর্ম-তত্ত্বকে, বিশ্বাসকে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে তথ্যের ও শাস্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন মাত্র। তাঁর অবচেতন মনেও সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁর 'প্রতিভা মূলতঃ সাহিত্যিক প্রতিভা নয়—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।' আর সে জন্যই তাঁর রচনা বেকনের মত 'ধারে ও ভারে যতটা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, ততটা সাহিত্যিক ও শিল্পগত দাবী মেটাতে পারেন না। ফরাসী লেখক মোঁতেনে' প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশ। মোঁতেনের মত রামমোহনের প্রবন্ধে রসের পরিণতি মুখ্য নয়—সিদ্ধান্তের, বক্তব্যের পরিণতিই মুখ্য। রচনার সহজাত রস স্বাচ্ছন্দ্য এখানে অনুপস্থিত।

বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এত বেশী সচেতন ভাবে শব্দ-চয়ন করেছেন যে তাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনাবশ্যক শব্দ একটিও নেই—ফলে লেখা গাঢ়বদ্ধ ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। যেমন—"যাঁহাদের কর্ম পর্যন্ত কেবল পর্য্যবসান তাঁহারা নাস্তিকের প্রভেদ কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া কর্ম হইতে তাবৎ ভোগাভোগ মানেন তাঁহাদের তাৎপর্য এই যে মানুষ সৎ কর্ম্ম করে সে উত্তম ফল পায় অসৎ কর্ম্ম করিলে অধম ফল পায় ঈশ্বর ইহাতে নির্লিপ্ত কাহাকে ঈশ্বর আপন আরাধনাতে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া সুখ দেন কাহাকে বা আপন হইতে ঔদাস্য প্রদান পূর্ব্বক অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া আরাধনা করে না এ নিমিত্তে দুঃখ দেন এমত স্বীকার করিলে তাঁহাতে বৈষম্যদোষ হয় যেহেতু উভয়ই তাঁহার সমান কার্য্য হয় অতএব এরূপ মিমাংসা মতে ঈশ্বরের একত্বে কোন দোষ হয় না।" তাই বলা চলে, শিল্পী-জনোচিত নৈপুণ্য না থাকলেও, সংযম, শব্দের পরস্পর দৃঢ়বদ্ধতা, নৈয়ায়িক স্পষ্টতা, উচ্ছ্বাস বর্জিত যুক্তির অবতারণা ও সর্বোপরি চিন্তার পরিচ্ছন্নতা

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের প্রায় সব শর্তই তাঁর রচনা পূরণ করেছে। নির্দিষ্ট কোন প্রতিপাদ্য সম্মুখে রেখে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে সুসংবদ্ধ ভাবে তাকে প্রকাশ করার রীতি রামমোহনই বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন। রামমোহন বাঙালীর চিন্তাধারায় একটি নতুন আলোড়ন এনেছিলেন যার ফলে বাঙালী স্বাধীনভাবে চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের সাহস পেল—পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে যার পরিণত প্রকাশ দেখি। তখন থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করে এবং কিছুটা রামমোহনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই বাংলাসাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল জ্যোতিষ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বহু প্রবন্ধ গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। তাই প্রবন্ধের আলোচনায় প্রাবন্ধিক রামমোহনের নাম সর্বাগ্রে স্মর্তব্য। রামমোহন তাঁর বিচার ও মনন শক্তি নিয়ে সমাজের জড়তা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মানুষের মঙ্গল সাধনের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতে নবজাগণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। যে বুদ্ধি ধর্ম ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ রামমোহনের বিদ্রোহ ঘোষণার মূলে ছিল বিদ্যাসাগরে সেটাই সত্যকার মানবকীর্তি ও মানব সেবায় এক উদার ও গভীর প্রেরণা হয়ে দেখা দিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তখন কৌলিক আচারের সংকীর্ণতা ও অন্ধকার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজ করছিল। নিজ পরিবারে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দারিদ্রের চরমরূপ। তিনি দেখেছেন নবযুগের অভিঘাতে ব্রাহ্মণের কুলমর্যাদা তলিয়ে গেছে—পরাশ্রিত ব্রাহ্মণশ্রেণীর শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে—বাঁচবার তাগিদে তাঁরা তাঁদের আভিজাত্যকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরেছে—যার ফলশ্রুতি কৌলীন্য প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি কুপ্রথা। এমনি পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে বিদ্রোহের বীজ এখানেই অঙ্কুরিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিংবা জন্মসূত্রে তিনি এই বিদ্রোহী মানসের উত্তরাধিকার

লাভ করেছিলেন একথা বলাও বোধ হয় ভুল হবে না। তবে এই উত্তরাধিকার পিতার নয়—পিতামহের। প্রবল চরিত্রের ব্রাহ্মণ্য তেজে নির্ভিক পুরুষ যিনি ভ্রাতাদের কথার প্রতিবাদে দেশত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। আর যে হৃদয়ধর্মের জন্য বিদ্যাসাগর বাঙালীর মনে 'দয়ার সাগর' রূপে বিরাজিত, তারও মূলে রয়েছে মাতা ভগবতীদেবীর প্রভাব। পরের দুঃখে যার চক্ষে ব্যথার অশ্রু ঝরতো। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পয়লা জুন ৯ বছর বয়সে পিতার সঙ্গে দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করে বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন—লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে। পিছনে ফেলে এলেন গ্রামকে; সঙ্গে পুরানো জীবনকে। কৈশোরের দীর্ঘ ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার নাগরিক পরিবেশে। যেখানে তখন নবীনের আধিপত্য প্রবল, অন্যদিকে প্রবীণ তার দাবী প্রতিষ্ঠিত রাখতে বদ্ধপরিকর। সেদিন হিন্দুকলেজেরর স্বর্ণোজ্জ্বল দিন, ইয়ংবেঙ্গলদের জাগরণের দিন। অথচ বিদ্যাসাগরকে ভর্তি করানো হল সংস্কৃত কলেজে—যে বিদ্যা সেযুগে 'সেকেলে বিদ্যা।' দীর্ঘ বারো বৎসর তিনি সমস্ত শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন ও কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য গুণে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন (১৮৪১)। এখানেই কিছুটা ইংরাজী শিক্ষা করেন এবং ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করেন।

বিদ্যাসাগর যখন গভীর ভাবে পড়াশুনায় মগ্ন ও নিবিষ্ট চিত্ত, তখন বাইরে সমাজে বিভিন্ন তরঙ্গের ভাঙ্গাগড়া চলছে। রামমোহন ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যে দ্বারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর কণ্ঠে তারই পূর্ণ উদ্‌ঘাটন। তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা চাইল মুক্তি—সমস্ত শাস্ত্রবিধি থেকে মুক্তি, সমাজের জড় বন্ধন থেকে মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল তেমনি উচ্চকণ্ঠ। ইংরেজের কাছ থেকে তারা পেল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের মন্ত্র, স্বাধীন চিন্তা করার শক্তি। শিখলো প্রাচীনের সমস্ত কিছুকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে। ভাবলো হিন্দুশাস্ত্রে যা নিষিদ্ধ তাই আচরণীয়। যা শাস্ত্র সম্মত তাই অসঙ্গত, অন্যায়। তাঁদের মুক্তবুদ্ধি, যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা, স্বাধীন চিত্ততা ও সত্যের জন্য জীবনদানের দুর্বার উল্লাসে

সমাজ-মানস চঞ্চল হয়ে উঠল। অথচ বিদ্যাসাগর কোন কিছুতে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাননি। একদিকে শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে অন্যদিকে দরিদ্র সংসারের গৃহকর্ম করে তাঁর দিন কেটেছে। কিন্তু কালের অন্তর প্রেরণা ব্যর্থ হবার নয়। তাই দেখি, বিদ্যাসাগরে পুরুষানুক্রমিক রক্তের শাসন মিথ্যে হয়ে গেছে। একযুগ ব্যাপী সংস্কৃত চর্চা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন কাজে কিছুটা সাহায্য করলেও—মন ও মানসিকতায় গভীর কোন ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়নি। যুগ-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁর জীবনে রূপায়িত হয়ে তার দাবী মিটিয়েছে। ইংরেজের ন্যায় শাস্ত্রাদির মর্মবাণী ও কুসংস্কারজয়ী মনন তাঁর চিত্ত স্পর্শ করেছিল। তাঁর প্রতিটি কাজে যে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ তা আমাদের দেশে ইংরেজ আগমনের ফল। তাঁর কর্মে ও প্রতিভায় যুগের প্রভাব অলক্ষিত নয়। তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রথম পণ্ডিত হিসেবে (১৮৪১ খ্রীঃ) তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয়। এখানে ক্যাপ্টেন মার্শেল, ডাঃ ময়েট, বিডন প্রমুখ উচ্চশ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরে হৃদ্যতা জন্মে। মার্শেল সাহেবের অনুপ্রেরণায় তিনি ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষা করেন—প্রথমে দুর্গা-চরণ বন্দোপাধ্যায় ও পরে রাজ নারায়ণ বসু এবং রাজ নারায়ণ গুপ্তের কাছে। রামমোহন যেমন শিখেছিলেন ডিগবীর সাহচর্যে ও সহায়তায়।

ইংরেজগণ তাঁর বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, জ্ঞানের গভীরতা, কাজের ক্ষমতা ও স্থৈর্য, তেজস্বিতা ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের চেষ্টাতেই বিদ্যা-সাগর ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। সংস্কৃত কলেজের পঠন প্রণালীর উন্নতি ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে নতুন পাশ্চাত্য বিদ্যার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটিয়ে মাতৃভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা। এই পরিকল্পনা প্রস্তুত

থেকেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংস্কারের শুরু—এখানে তাঁর 'চিন্তাশীলতা ও প্রতিভা'র প্রকাশ ঘটেছে—এবং পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনারই যথাযথ রূপদানে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু এ নিয়েই সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। সম্পাদক তাঁর পদাধিকার ক্ষমতা দিয়ে বিদ্যাসাগরকে চাপ দিতে থাকেন। তাঁর মধ্যে বিবেক বা ন্যায়-বোধের বালাই ছিলনা, হয়ত বা ভয় ছিল কর্তৃত্ব হারাবার। বিদ্যাসাগরের ন্যায়, আদর্শবাদী মন এ অন্যায়কে সহ্য করতে পারেনি—তাই সংঘাত শুরু হ'ল, স্বার্থের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত। বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করলেন (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই)। প্রমাণ করলেন বাঙালীর তেজস্বিতা ও সম্মানবোধ কম নয়। স্মর্তব্য যে এসময়ে বিদ্যাসাগর তাঁর বেতনের ২০ টাকা বাবাকে দেশে পাঠিয়ে বাকী ৩০ টাকায় ৯ জনের সংসার চালাতেন। দারিদ্রের যে নির্মমতায় ছোটবেলা থেকে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, তা তখনও দূর হয়নি। অথচ চাকরী ছাড়তে তিনি এতটুকুও ইতস্তত: করেননি। অসীম মনোবল ও সৎসাহসের সঙ্গে বলেছেন, 'আলু পটল বেচে খাব।' এ প্রসঙ্গে কার সাহেবের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি জুতা-সহ-পা টেবিলে তুলে কথা বলেন। বলাবাহুল্য বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানবোধে ঘটনাটি তীব্র আঘাত হেনেছিল। বিদ্যাসাগর ঠিক তেমনি ব্যবহার করে এর প্রতিশোধ নেন। শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারী কৈফিয়ত চাইলে তিনি বলেন, অভ্যর্থনার এ-রীতি তিনি শিক্ষিত ও সভ্য কার সাহেবের নিকট থেকেই শিখেছেন। উনিশ শতকে এই সম্মান বোধের প্রকাশ কমবেশী প্রায় সব শিক্ষিতদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এমন অখণ্ড ব্যক্তিত্ব ও তেজ তাঁর পূর্ব-পুরুষ রামমোহন ব্যতীত আর কারো ছিল না। রামমোহনও স্যার ফ্রেডরিক হেমিল্টনের সম্মুখ দিয়ে পাল্কী করে চাপরাশী বরকন্দাজ সহ যেতে দ্বিধা করেন নি।

সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করার পর বিদ্যাসাগর আবার ফোর্ট উইলিয়ামে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ রূপে যোগ দেন। এ সময়েই তাঁর

প্রথম পুস্তক 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি' (১৮৪৭) প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি কয়েক মাস পরে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হলেন, এই শর্তে যে, তাঁর সুপারিশ মত কলেজ পরিচালনায় সংস্কার সাধন করতে হবে। কর্তৃপক্ষ সম্মত হলেন। কাজ শুরু করার ১২ দিনের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা রচনা করেন। যা তাঁর দীর্ঘ চিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা প্রসূত। রসময় দত্ত পদত্যাগ করলে (১৮৫০) বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এবং সর্বাধিক কর্তৃত্ব পেয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত শক্তি শিক্ষার উন্নতিতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু শুধু শিক্ষার সংস্কার নয়, কলেজের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ব্যাপারেও তাঁর কালচেতনা ও সমাজ বিপ্লবী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বের তিথি অনুযায়ী কলেজ বন্ধ দেওয়া বাদ দিয়ে ইংরেজী স্কুলের ন্যায় রবিবারে বন্ধ দেবার রীতি প্রচলন করেন। শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য নয়, কায়স্থ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ছাত্রদের জন্যেও সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের ঠিক সমান কাজ করার জন্যে সচেতন করে দেন। বিদ্যালয়ের শাসন শৃঙ্খলার দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন। ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতির উপায় রূপে তিনি দু'টাকা প্রবেশ ও পুনঃ প্রবেশ দক্ষিণা নির্ধারণ করেন। পরে মাসিক একটাকা বেতন দেবার রীতি চালু করেন।

অন্যদিকে তাঁর প্রধান লক্ষ্য হল সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং ইংরেজী ও সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান না থাকলে বাংলা-সাহিত্য সৃষ্টি যে সম্ভব নয়, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত সমান গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান লাভের পথ সহজ ও সুগম করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলায় 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' লিখে তা কলেজ পাঠ্য করলেন। তিনি চাইলেন বাংলা ভাষা যাতে দেশীয় ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে বিদেশী জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে গৃহীত সমস্ত সূক্ষ্ম

ও জটিল ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠার শক্তি অর্জন করে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হলেও কর্ম ক্ষেত্রে নেমে তিনি বুঝেছিলেন—এটা ইংরেজী শিক্ষার যুগ। রামমোহনের মত তাই দেশের মানুষকে অধঃপতন ও জড়তা থেকে উদ্ধার কবার জন্য তিনি ইংরেজী শিক্ষাকে ও পশ্চিমের চিরন্তন গতিবাদকে স্বীকার করেন ও সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি ইংরেজী শাস্ত্রাদিকে বিশুদ্ধ সত্যের আধার এবং ইংরেজী শিক্ষা ও শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনাকে জ্ঞান ও সত্য-পোলব্ধির উপায় বলে মনে করতেন, এখানেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর মিল। তিনি সৃষ্টি করতে চাইলেন এমন এক শ্রেণীর মানুষ, সমস্ত শাস্ত্রে যারা হবে সুপণ্ডিত অথচ দেশের কুসংস্কার তাদের স্পর্শ করবে না। এঁরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে দেশবাসীর মনে জ্ঞানের আলো বিস্তার করবে।

বিদ্যাসাগর চরিত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মে সমানভাবে কাজ করেছে। সংস্কার মুক্ত মন, মানবপ্রেম ও যুক্তিবাদ। তিনি দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ণয়ে ও শিক্ষার প্রসারে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন হৃদয়স্থিত মানবপ্রেম থেকে, কাজ করেছেন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে যুক্তির সাহায্যে। লক্ষ্য করলেই বুঝতে অসুবিধা হয়না যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-নীতি রামমোহনের শিক্ষানীতিকেই অগ্রগতি ও পরিণতি দান করেছে। ভারতের অধ্যাত্মবাদ নয়, এই শিক্ষানীতিতে রয়েছে পাশ্চাত্যের দেহাত্মবুদ্ধি তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাধান্য। কোন প্রকার কুসংস্কার বা গোঁড়ামী তাঁর মধ্যে প্রশ্রয় পায়নি। তিনি কখনই বিশ্বাস করতেন না যে, সর্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে। যা মানুষের বাস্তবজীবনে কার্যকর নয়, যা মানবিকতার পরিপন্থী তা যদি শাস্ত্রসম্মতও হয় তবু তার কোন মূল্য তিনি দিতেন না। যা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, যা জীবনের ক্ষেত্রে কার্যকর শুধু সেগুলিকেই তিনি নিজের জ্ঞান বিচারবুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করে স্বীয় সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতেন। তিনি ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার সমর্থক ছিলেন এবং তা থেকে মনের খোরাক

ও জীবনের আদর্শ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তাঁর সংস্কার ও অচল মানসিকতাকে তিনি কখনই স্বীকার করেননি। তাইতো একই সঙ্গে বার্কলের গ্রন্থ এবং বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলতে তিনি দ্বিধা করেননি।

মানুষের মনুষ্যত্বই বিদ্যাসাগরের কাছে বড় ছিল, আর সেই মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর সাধনা। তাঁর জীবনের যা কিছু কাজ—শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা সব কিছুরই পেছনে রয়েছে সেই একটি মাত্র উদ্দেশ্য—মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। এবং সেজন্য প্রয়োজন যে জ্ঞান, তার আলো মানুষের মনে প্রজ্বলিত করার জন্য বিদ্যাসাগর বিভিন্ন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন। ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সুদূর গ্রাম-বাসীর মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলা মডেল স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের সহায়তা ও পরিকল্পনা। অক্লান্ত পরিশ্রম, দৃঢ় মনোবল ও সাফল্য লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সরকারী সাহায্যে তিনি শিক্ষা বিস্তারে অবতীর্ণ হন। ভেবে বিস্মিত হতে হয় সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে, সংস্কৃত ঐতিহ্যে মানুষ হয়ে এবং সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়েও বাঙলা ভাষার সেবা ও উন্নতিতে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, 'সু বিস্তৃত ও সুব্যাবস্থিত বাংলাশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছণীয় কেন না মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।' এই 'শ্রীবৃদ্ধি'র জন্যেই তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, দেশ ও বিদেশের ভালো ভালো বই অনুবাদ করেছেন, সর্বোপরি দেশের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝিয়ে তাদের আগ্রহী করে তুলেছেন। পথের সমস্ত বাধা বিঘ্নকে দৃঢ় হস্তে অসীম সাহসিকতা ও মনোবল নিয়ে অপসারিত করেছেন। এই মানবকেন্দ্রিক চিন্তা বা Humanism নবযুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই নতুন চিন্তার জন্যেই নবযুগ রেনেসেঁসের যুগ, নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণের যুগ। বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির মূলেও রয়েছে এই Humanism এর বীজ। তাঁর শিক্ষা সংস্কারের

মানদণ্ড ছিল মানুষ। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন-প্রচেষ্টার মূলেও রয়েছে এরই প্রেরণা। রামমোহন রায় হিন্দু সমাজের সংস্কার সমস্যার সমাধানের জন্যে চিন্তা করেছিলেন—কিছুটা বাস্তবে রূপায়িত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন, আর বেশীর ভাগ নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন। এবং এতে করে আর কিছু না হোক তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ-মানসে একটা ভাবের অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। এটা সত্যিকথা, হিন্দু সমাজে এমন কোন কুসংস্কার নেই যা নিয়ে 'আত্মীয় সভায়' আলোচনা হয়নি। 'স্ত্রী শিক্ষা' সে সবের একটি। পরবর্তীকালে, ইয়ংবেঙ্গলেরা পত্র পত্রিকা ও 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন'এ আলোচনার মাধ্যমে এতে একটা গতি সঞ্চার করে। তাদের অসম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়িত করেন ভারত হিতৈষী জনকয়েক ইংরেজ ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। খ্রীস্টান মিশনারীগণ ভারতে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেন। মিস কুক তাদের এই প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ফলে শিক্ষিত সমাজ স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বেশ কিছুটা সচেতন হন। কিন্তু পাদ্রীদের উৎসাহ ও কুকের আন্তরিকতা সত্ত্বেও সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার আলোড়ন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি।

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রায় প্রথম থেকেই বেথুনের সঙ্গে ছিলেন অক্লান্ত কর্মীপুরুষ বিদ্যাসাগর। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের কুসংস্কারের বেড়া ভাঙতে বিদ্যাসাগর দৃঢ় পদক্ষেপে, দুর্জয় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হলেন। দেশবাসীর সামাজিক-সংস্কার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সামনে—তাঁদের মনকে নাড়া দেবার জন্য গাড়ির পাশে 'কন্যাপ্যেবং পালণীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ' শাস্ত্র বচন উধৃত করলেন, কিন্তু তাতে ও বিশেষ সুফল ফলেনি। এ ছাড়াও ছিল সরকারের প্রতিকূলতা, ছিল শিক্ষয়িত্রীর অভাব। ব্রাহ্ম সমাজ এ আন্দোলনে উৎসাহ যোগালেও, নিজের পরিবারের স্ত্রীদের বাইরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবার মত মানসিক-শক্তি তাঁরা তখন পর্যন্ত অর্জন করতে পারেননি। এ ব্যাপারে

সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু ও সহকর্মী মদন মোহন তর্কালঙ্কার, ও ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কিছু পরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্ম যুবক। কিন্তু তার আগেই ১৮৫৭ সালের শেষ থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন আর তাতে পড়াশুনা করে ১৩০০ মেয়ে। তৎকালীন বঙ্গসমাজে এ ঘটনা অচিন্ত্যনীয় ছিল।

দুর্জয় সঙ্কল্পে ও স্থির বিশ্বাসে বিদ্যাসাগর এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তিনি দেশের মানুষকে, তাদের মানসিকতাকে জানতেন, বুঝতেন এবং তাদের সংস্কার ও রীতির দিকে লক্ষ্য রেখে সঠিক ভাবে কাজ করতেন বলেই সাফল্য সুনিশ্চিত হত। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রী-পুরুষের সমান শিক্ষার মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করে। বিভিন্ন কারণে ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন। সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শিক্ষা বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় ও অধীনে প্রথম উচ্চতর শিক্ষার কলেজ। এ কলেজ প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে এ কলেজ তিনি সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তোলেন। বাঙালী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এ কলেজ তৎকালীন কোন কলেজ থেকে নিকৃষ্ট ছিল না। সমস্ত প্রকার বাধা বিপত্তি থেকে রক্ষা করে কলেজটিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। লোক হিতৈষণার সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি।

নবযুগের সমাজ ব্যবস্থা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিল সেকথা বলেছি; এবং এরই ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সবাই সচেতন হল। বিদ্যাসাগরের বাস্তব-চেতনা ও ব্যক্তিত্ববোধ তাকে সামাজিক

প্রতিষ্ঠা লাভে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অর্থসর্বস্ব এই সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গেলে, সবচেয়ে আগে টাকার প্রয়োজন। রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলের অনেকে এই বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার নবজাগরণে তাদের মধ্যে হয়েছে স্বাধীন বাণিজ্য বৃত্তির উন্মেষ। তাঁরা নবযুগের ধারক ও বাহক। সংসারে ও সমাজে সংস্কারের দুরূহ কর্ম সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকে তারা স্বাধীন ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তারা বণিকের মত বিত্ত মূলধন করে পণ্যের বানিজ্য করেছেন। রামমোহন করেছেন কোম্পানির কাগজের ব্যাবসা, বেনিয়ানি ও মহাজনী। রামমোহন ও অন্যান্যদের মত বিদ্যাসাগরের বিত্ত ছিল না, তাই তিনি বিদ্যাকে মূলধন করে ব্যবসা ক্ষেত্রে নামেন। 'পণ্য-প্রাণ যুগে প্রাণ ধারণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিদ্যাকেই পণ্য করেছিলেন।' সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটরি তিনি স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। জনসাধারণ ও ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর ১৯৪৭ সাল থেকে বই লিখতে শুরু করেছিলেন, ফলে একধারে তিনি মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হলেন। সমসাময়িকদের বাণিজ্যিক বুদ্ধির সঙ্গে এখানে তাঁর পার্থক্য যথেষ্ট। তাঁরা ব্যবসা করেছেন অর্থোপার্জন করার জন্য এবং তা একান্তভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই বাণিজ্যিক বুদ্ধির পশ্চাতেও রয়েছে দেশবাসীর জন্য এক গভীর কল্যাণবোধ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'সবরকম মুক্তির আগে মানস-মুক্তির প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষ-প্রসারের। নবযুগের মুদ্রিত বই-ই হতে পারে, শিক্ষার বাহন লিপিকরের লেখা পাণ্ডুলিপি নয়। শিক্ষার প্রসার ছাড়া সমাজ সংস্কারেরও স্বার্থকতা কম। মুদ্রণ যন্ত্র তাই নবযুগের জ্ঞান বিদ্যার প্রমিথিউস। মুদ্রণ যন্ত্রের মূল্য ও তাৎপর্য বুঝেই তিনি এটাকে সার্থক করে তুলতে সচেষ্ট হন। জীবনের ব্রতের সঙ্গে বৃত্তির সমন্বয় সাধনই তাঁর ইচ্ছে ছিল। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার যাঁর জীবনের ব্রত; স্বাধীন মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থাকারের বৃত্তিই তাঁর উপযোগী বৃত্তি।

কর্মেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। রামমোহন তথা ব্রাহ্মসমাজ এবং ইয়ংবেঙ্গলের মত শুধু চিন্তা করেননি, আলোচনা সভা আহ্বান করেননি, তর্কে বিতর্কে সময় কাটাননি, কিংবা পুস্তকে আর পত্রিকায় নিজের মতাদর্শ প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি—যা তাঁর কাছে কল্যাণ, সত্য এবং উচিত বলে মনে হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সে জন্যেই তাঁর প্রতিটি কাজ গভীর চিন্তাপ্রসূত। কোন প্রকার অস্থিরতা বা আকস্মিকতার অবকাশ সেখানে নেই। তিনি রামমোহন ও ইয়ংবেঙ্গল যুগের সামাজিক আদর্শের সার্থক উত্তরাধিকারী।

সমাজে বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, ও কৌলীন্য প্রথার ব্যাপক প্রচলন তিনি দেখেছিলেন—এসবের পরিণতি হিসেবে অকাল-বৈধব্যের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তাঁর সমগ্র সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধ অধ্যাপক সম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির তরুণী পত্নীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় তিনি অধ্যাপকের ঘরে জলস্পর্শ করেন নি। বৌদির মৃত্যু রামমোহনকে সহমরণ প্রথা রোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বিদ্যাসাগরের বাল্য-সঙ্গিনী সুরোর অকাল বৈধব্য ও তার বেদনার্ত মুখ, তাঁর বিদ্রোহী সত্তায় ইন্ধন যোগালেও যোগাতে পারে। সর্বোপরি ছিল মা ভগবতী দেবীর নেপথ্য প্রভাব। প্রতিবেশীর আট বছরের সদ্য-বিধবা হওয়া মেয়েকে দেখিয়ে তাঁর উক্তি—'তুই তো এতবড় পণ্ডিত' এই মেয়েদের এরকম দুর্গতি দূর করার কি কোন উপায় নেই? শুনেই বোধকরি বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয় বিধবা বিবাহ প্রচলন করার দুর্জয় সংকল্প গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে এমন গতি ও শক্তি দান করতে সক্ষম হত না, যদি না সমাজে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকত। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'তে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও আলোচনা হত, পরে ডিরোজিওর 'অ্যাকডেমিক অ্যাসো-

সিয়েশনে' ইয়ংবেঙ্গলদের কণ্ঠে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেবার ঐকান্তিক ইচ্ছে নিয়ে উনিশ শতকের তিরিশ চল্লিশে এই আন্দোলনে তারা একটা তীব্র গতি সঞ্চার করে, পঞ্চাশে এই সংস্কার-চেতনা বিদ্যাসাগরে সংহত হয়ে প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। তিনি সুনির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করলেন আন্দোলনকে।

রামমোহনের সমাজ সংস্কারমূলক শ্রেষ্ঠ কীর্তি সতীদাহ নিবারণ, আর বিদ্যাসাগরের এই বিধবা বিবাহ প্রচলন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেন 'তত্ত্ব বোধিনী' পত্রিকায় ১৭৭৬ শকাব্দে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৫, জানুয়ারী মাসে। পরাশর সংহিতার—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধীয়তে॥

এই স্পষ্ট বচন অবলম্বন করে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিৎ কিনা এই প্রশ্ন তুললেন। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর হিন্দুসমাজে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। প্রাচীনেরা তাঁকে খ্রীস্টান বলে গালি দিতে লাগলো, আর বিত্তবান লোকেরা ভট্টাচার্যের দ্বারা ছোট ছোট বই লিখিয়ে তাঁর মতের বিরোধিতা করতে লাগলেন। প্রায় প্রতিটি সংবাদ পত্র তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু বিদ্যাসাগর সেদিন উত্তাল সমুদ্রের মাঝে দৃঢ় হস্তে হাল ধরেছিলেন। তিনি জানতেন, বুদ্ধি যুক্তি বিচার বিবেচনা দ্বারা এদেশের লোকের মন টলে না, সে জন্য তিনি শাস্ত্রের দ্বারস্থ হলেন। বিধবা বিবাহের প্রথমেই লিখলেন 'যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।' তাই অনেক আশায় প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রের অতল সমুদ্র মন্থন করে তিনি নিজ মতপ্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রীয় বচন খুঁজেছেন। যেমন খুঁজেছিলেন রামমোহন সতীদাহ

প্রথা রোধ করার উদ্দেশ্যে। তাঁরা যুক্তির, বিচারের, বিশ্লেষণের পক্ষপাতী হয়েও শুধুমাত্র নবযুগে মানুষের মনে কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্যে শাস্ত্রকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন: শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজেছেন। বিদ্যাসাগর মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞ বল্ক্য, অন্দিরা ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রকারের পরিচয় দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পরাশর সংহিতাই কলিযুগের প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র। এবং তা থেকেই প্রমাণ করলেন 'কলিযুগে বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম্ম তাহা নির্বিবাদে সিদ্ধ হইল।' সবশেষে তিনি জনসাধারণের আছে অনুরোধ জানান 'আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া এবং বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহার আদ্যোপন্ত বিশিষ্ট আলোচনা করিয়া দেখুন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা। কিন্তু তার এ আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল, তিনি দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন বাঙালীর দেশাচার ও লোকাচার এত প্রবল যে শাস্ত্র বাক্যও সেখানে কার্যকরী হয় না। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।—'ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস···তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে' অধর্ম্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।

বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকাটিতে (১৮৫৫ খ্রী) তিনি বিরুদ্ধ বাদীদের কটূক্তি ও যুক্তি খণ্ডন ও পরাশর সংহিতার বচনটির বিশ্লেষণ করেছেন পঁচিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই গ্রন্থটির পাতায় পাতায় বিদ্যাসাগরের সুগভীর শাস্ত্র জ্ঞান বিচার বুদ্ধি, মানসিক দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় মনীষার সুস্পষ্ট প্রকাশ। তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতায়, শাস্ত্র বচনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় প্রতিপক্ষের সমস্ত আপত্তি ভেসে গেছে।

এমন শাস্ত্রীয় মীমাংসা রামমোহনের পর আর কেউ করেননি। রামমোহনের মত বিদ্যাসাগরও বিরোধীদলের রূঢ় অশালীন সমালোচনার সম্মুখীন

হয়েছিলেন, কিন্তু ধৈর্য হারাননি। তাঁর ভাষা মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়েছে মাত্র। দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রথমেই বলেছেন, 'এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারের এক অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না।' কিংবা, 'সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারের প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাস বাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।' বলাবাহুল্য কথাগুলি তাঁর অন্তর্বেদনারই বহিঃপ্রকাশ। নারীজাতির সমস্ত প্রকার দুর্বলতা ও অসহায়তা সম্বন্ধে তিনি গভীর চিন্তা করেছেন। তাঁদের বাসনা কামনা ও ইচ্ছার সমর্থনে তিনি বলেছেন, 'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয়না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয়না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে।' এবং সবশেষে তাঁর ব্যথা-ভারাক্রান্ত উক্তি, 'হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই ধর্ম নাই ..... , আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারিনা!'

সমাজ সংস্কারে এই মানবিক আবেদন একেবারে নতুন জিনিষ। এই আবেদন অনেক শিক্ষিত হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল যার প্রমাণ পরবর্তীকালে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর যখন বুঝলেন দেশাচারের পাকে পাকে দেশবাসী এত জড়িয়ে গেছে যে এই বাঁধন শুধু শাস্ত্রবচনে খুলবে না এর জন্য আরও কিছু প্রয়োজন তখন ব্রাহ্ম সমাজের উদার ভাবধারায় পরিপুষ্ট বিদ্যাসাগর রামমোহনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখে আইনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ করার জন্য এক হাজার স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন পত্র বড়লাটের দরবারে পেশ করলেন। তাঁর সমস্ত পরিশ্রম সার্থক করে

১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ হয়ে গেল এবং ৭ই ডিসেম্বরে প্রথম বিধবার বিয়ে হল। বিদ্যাসাগর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন করলেন। সাহায্য ও সহায়তা করলেন সেযুগের সমস্ত সমাজ-হিতৈষী বাঙালী।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পূর্বে ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় প্রথম সমাজসংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধ 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটিতে তিনি সমাজ, স্বাস্থ্য ও নীতি—এই তিন-দিক দিয়ে বাল্যবিবাহের দোষ বর্ণনা করেছেন। তখন থেকেই সমাজের কুসংস্কারগুলি সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা সচেতন মতামত গড়ে উঠে—তাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল—'অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি দিগকে আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষাদান বিষয়ে যেরূপ উদযোগ করিবেন, তদ্রূপ বল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করনেও যত্নশালী হউন নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পরিবেন না।'

বিদ্যাসাগরের বাস্তবতা সচেতন ও মানবদরদী হৃদয়ের অন্য প্রকাশ ঘটেছে 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (দুই খণ্ড) (১৮৭১ ও ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ) পুস্তকে। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় বিচার আর আইন পাশ নিয়ে যখন দেশবাসী সমালোচনায় ও সমর্থনে মুখর ঠিক সে সময়েই বিদ্যাসাগর সহস্র লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের কাছে আবেদন পত্র প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য হল, আইন বলে বহুবিবাহপ্রথা তথা কৌলীন্য প্রথা রোধ করে সামাজিক কলুষতা থেকে বাংলা দেশকে উদ্ধার করা। কিন্তু সরকার এ আবেদন গ্রাহ্য করেননি। আন্দোলন তীব্র হল। বিদ্যাসাগর পুনরায় ১৮৬৬ সালে ২১ হাজার লোকের স্বাক্ষর সহ পাঠালেন দ্বিতীয় আবেদন পত্র, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলনা। বিদ্যাসাগর তাতেও নিরুৎসাহ হলেন না। কারণ তিনি দেখছেন, কৌলীন্য প্রথা এবং তার ফলে বহু বিবাহ প্রভৃতি আচারের দুর্নীতি ও ব্যভিচার সমাজকে ক্ষয়গ্রস্থ ও পঙ্গু

করে তুলছে। শাস্ত্রীয় আচারের ভাওতায় অকাল বৈধব্য ভ্রূণহত্যার মত পাপ -কাজ অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। এ সব নিষ্ঠুর পাশবিক ক্রিয়াকলাপে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হল, ক্ষত বিক্ষত হল। তাই সরকারী সাহায্য ও আনুকূল্য না পেয়েও তিনি এগিয়ে চল্লেন এবং লিখলেন বহুবিবাহ বিষয়ক দুই খণ্ড পুস্তক। এর পূর্বে ১৮৪২ সালে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় এ বিষয়ে আন্দোলন ও আলোচনা হয়, সে আলোচনার গতি কখনও থেমে যায়নি। বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তকে কুলীনদের প্রতিটি যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন সংহিতা থেকে শাস্ত্রবাক্য উধৃত করে দেখিয়েছেন কোন শাস্ত্রেই বহু বিবাহের উল্লেখ নই। শাস্ত্র তিন প্রকার বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের পরিণামে কি হচ্ছে, সে সব অনাচার, দুর্নীতি, ব্যভিচার এবং নারী নির্যাতনের করুণ ও মর্মস্পর্শী কাহিনী তিনি পাঠক সমাজে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কুলীন ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত ধিকৃত জীবন-ইতিহাস।

তিনি আকুল আর্তি জানিয়েছেন, পূর্ব প্রচলিত 'সর্বদ্বারী বিবাহ' চালু করার জন্য। চেয়েছেন নারীদের সম্মানজনক মানবিক প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তৎকালীন পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্যরা তাঁর সমস্ত কথাকে, যুক্তিকে অস্বীকার করেছেন—শাস্ত্রের মিথ্যে দোহাই দিয়ে। স্বভাবতই বিদ্যাসাগর দুঃখিত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন এবং সেজন্যেই দেখি দ্বিতীয় পুস্তকে প্রথমেই তাঁর শ্লেষপূর্ণবাক্য ঃ

'ধর্মবুদ্ধির অধীন হইয়া শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে, লোক যেরূপ আদরণীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েন ; রোষমনে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ বিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইলে, লোককে তদনুরূপ অনাদরণীয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয়। ফলতঃ এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কিংবা অন্যত্র ব্যঙ্গ করে—

'অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানাশাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কোন ও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই, বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই।'

প্রতিবাদী দল বিদ্যাসাগরকে অধৈর্য হয় আক্রমণ করেছেন যেমন করেছিলেন বিধবা বিবাহ প্রচলন রোধ করার জন্যে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রজ্ঞান, তর্ক নিপুণতা, ও মীমাংসা পটুতার সম্মুখে সমস্ত খণ্ডিত ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। বিদ্যাসাগরের এই সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় সমাজ যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তিনি তাঁর আন্দোলনকে আর ও তথ্যভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে সারা প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে বহুবিবাহকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। আইনত বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রোধ প্রচেষ্টা সমর্থিত হয়নি সত্য কিন্তু এ আন্দোলন সামগ্রিক ভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নন্দিত হয়েছে; ছড়ায় গানে মানুষ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছে, আর রাম-নারায়ন তাকে ফুটিয়ে তুললেন জনসমক্ষে নাটকের (কুলীনকুল সর্বস্ব) মাধ্যমে। কালক্রমে কৌলীন্য প্রথার অবসান ঘটেছে। এর পরও বহু প্রতিপক্ষের প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর আরও পাঁচটি বই লেখেন, 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) 'ব্রজবিলাস' (১৮৭৪) 'বিধবা বিবাহ' ও 'হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা' (১৮৮৪) এবং 'রত্ন পরীক্ষা' (১৮৮৬)। বইগুলি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও পরিহাস রসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বইগুলিতে শাস্ত্রের ও যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের স্পর্শও যুক্ত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি হাস্য-পরিহাস-শ্লেষ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে এসবে উজ্জ্বল হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানবপ্রেম একাধারে প্রকাশিত হয়ে এগুলিকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। তাই এগুলি নিছক শাস্ত্রালোচনা না হয়ে সাহিত্য রসে সঞ্জীবিত হয়েছে। সেকালের জীবনাদর্শ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সমাজ কর্মে আত্মোৎসর্গ করেন। এবং যে কথা আগেই বলেছি, তাঁর সমাজ-

কর্মের মূল লক্ষ্য হল, মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্যায়ণ। জাতি, ধর্ম অর্থের দ্বারা নয়, আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক কিছুতে নয়, এই বাস্তব জগতে সুখে দুঃখে গড়া যে মানবজীবন মানুষ হিসাবে তাদের বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ভগবানের আরাধনা বা অ্যধাত্ম সাধনার কোন ইতিহাস তাঁর জীবনে নেই। মানুষের মনে সাড়া জাগাতে শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন, কিন্তু নির্বিকল্প তত্ত্ববাদী তিনি ছিলেন না। রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করেছেন এবং সমন্বয় খুঁজেছেন, বিদ্যাসাগর সেই ধর্ম সমালোচনা ও পথ নির্ধারণের পরিপার্শ্বিকতায় অবস্থান করেও ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন, ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এতে প্রবন্ধ লিখেছেন, এবং পরে সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু সমস্ত ধর্মালোচনাকে পাশে সরিয়ে রেখে। ধর্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনা হলে তিনি তা এড়িয়ে যেতেন। সমালোচকেরা তাঁর এই উদাসীন মনোভাবের কারণ স্বরূপ বলেছেন, ধর্ম অপেক্ষা কর্মেই তাঁর অনুরাগ ছিল বেশী, ঈশ্বর সেবার চেয়ে পর সেবাকে শ্লাঘনীয় ভাবতেন। ধর্মকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে মানুষের প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিচার করেছেন। প্রত্যক্ষ জীবনের অজস্র সমস্যা ও ব্যথা বেদনা নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে বৈদেহী চেতনা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তাঁকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এটাই বোধহয় শেষ কথা নয়। তাঁর বিভিন্ন চরিতকার, মতামত বিশ্লেষণে, তাঁর ধর্মজীবনের দ্বিবিধ রূপ উদঘাটিত হয়। বিদ্যাসাগর বাল্যকালে প্রতিমা পূজার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না। যথেষ্ট মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি ভুলে গিয়েছিলেন। পিতা পিতামহীর অনুরোধে দীক্ষা ও মন্ত্র গ্রহণে সম্মত হননি। শ্রাদ্ধাদি স্মৃতি সংহিতা মতেই করতেন কিন্তু স্মার্ত আচার অনুষ্ঠানের

প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলনা। ধর্মকর্মে ও আচার পালনের মূল্য দিতেন না—তাঁর মতে এসব 'ধর্মকর্ম্ম সব দলবাঁধা কাণ্ড।' হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে রক্ষণশীল ছিলেন না—প্রমাণ হল, ভাটপাড়ায় গিয়ে কায়স্থ বন্ধু অমৃত লাল মিত্রের পাত থেকে মাছের মুড়া কাড়াকাড়ি করে খেয়েছিলেন, এবং সেজন্য স্থানীয় সনাতন পন্থী ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। আবার অন্য দিকে, কারো ধর্মবিশ্বাসে তিনি বাধা দিতেন না: রামমোহনের মত হিন্দুর প্রতিমাপূজায় আস্থা হারিয়ে নতুন ধর্ম প্রণয়নে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, ইয়ং-বেঙ্গল দল হিন্দুয়ানীর উপর আস্ত্রাঘাত করেছিলো, কিন্তু বিদ্যাসাগর একেবারে চুপ। চিঠি পত্রাদির উপরে দুর্গা, হরি প্রভৃতি দেবদেবীর নাম লিখতেন। জাতিভেদ প্রথা মানতেন না কিন্তু নিজ জীবনে কখনও কদাচার করেননি—পৈতাও ত্যাগ করেননি। অন্যখানে তাঁর উক্তি, 'এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি; তবে ঐ পথে না চলিলে এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয় পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করিনা।'

তাই বাস্তবজীবন ও মানবপ্রেমই বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর-নিরপেক্ষ মনোভাবের একমাত্র কারণ বলা চলে না, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে চিত্ত-সংকট, মুক্তি আর আচার-পরায়নতায় যে বিরোধ তারই প্রতিফলন বিদ্যাসাগর-মানসে। রামমোহন হৃদয়ধর্মকে প্রশ্রয় দেননি, একান্ত ভাবে যুক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন বলে, সেখানে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের অবকাশ নেই। বিদ্যা-সাগর যুক্তিবাদী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু হৃদয়ের আবেগ ও মানবপ্রেম তাঁর কর্মকে প্রভাবিত করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এই জ্ঞান এবং প্রেমের দ্বন্দ্বে ও তার তরঙ্গাঘাতে তিনি কখনও উজ্জ্বল, কখনও ঘোর সংশয়বাদী। এবং এই সংশয় ছিল বলেই ঈশ্বর নিয়ে তিনি ভাবতেন না কিংবা ভাবতে ভয় পেতেন। ঈশ্বর আছেন স্বীকার করেও ধর্মবিশ্বাসে আস্থা নেই তাঁর। এই পৃথিবীই তাঁর সাধনার তীর্থক্ষেত্র, তাঁর সাধনার

লক্ষ্য মানুষ। রক্ষণশীল সমাজ যখন তার ব্রহ্মকে বাঁচানোর উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব, বিদ্যাসাগর তখন মানুষকে ব্রহ্মের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্‌যোগী। বিদ্যাসাগর তত্ত্ববিচার করে রামমোহনের মত মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন নি। রামমোহনের তাত্ত্বিক উপলব্ধি বিদ্যাসাগরে ব্যবহারিক কর্মে পরিণতি লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের জীবন ও তাঁর তত্ত্ব অভিন্ন। জ্ঞান ও কর্মের বোধ ও ব্যবহারের ঐক্য তাতে সম্পূর্ণ। এই জীবনবাদই তাঁর অনুভূতিকে করেছে প্রখর, কর্মকে দুর্বার এবং পৌরুষকে করেছে অকুতোভয়। এই জীবনবাদই তাঁকে মর্তের বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবকাশ দেয়নি। এই দুটোই সত্য।

বিদ্যাসাগর কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। যখন ইয়ং-বেঙ্গল দল স্মিথ ও বার্ক এর গ্রন্থ পড়ে রাজনীতিতে মেতেছিলো, সে সময় বিদ্যাসাগর বাঙালী সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। তাঁর জীবদ্দশায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই অলস রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে কোন সার্থকতা খুঁজে পাননি। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি, 'বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে, তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে? যে দেশের লোক দলে দলে না খাইয়া প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে সে দেশের আবার রাজনীতি কি?' তবে সম্ভবতঃ ইংরেজ শাসনকে তিনি সমর্থনই করেছিলেন। তাঁর সমাজসংস্কার সম্ভব হত না যদি ইংরেজের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা বাঙালী সমাজে বিপ্লব না আনতো। রামমোহন আঘাত করেছিলেন হিন্দুধর্মকে আর বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজকে। ইংরেজ সৃষ্টি করছিল বাইরের দিক (রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলওয়ে স্থাপন, ডাকতার চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি) আর রামমোহনের মত বিদ্যাসাগর করছিলেন ভেতরের দিক। তাই ইংরেজ শাসনের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ বাঁধেনি।

কোন রকম সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামিকে বিদ্যাসাগর প্রশ্রয় দেননি। তাঁর সমস্ত সাধনা সমস্ত পরিশ্রম দেশবাসীর (ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে) কল্যাণ প্রয়াসে। দেশবাসী সংস্কার মুক্ত হয়ে চিন্তা করতে শিখুক, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধে উদ্বুদ্ধ হোক, ভালোকে দৃঢ়চিত্তে গ্রহণ করার সাহস অর্জন করুক, সমস্ত নীচতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হোক, অন্যের দুঃখে সহানুভূতিশীল হোক তাঁর নিজের সমস্ত ঔদার্য, ব্যক্তিত্ব, অহংচেতনা, সহানুভূতি দিয়ে তিনি এ সবের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। বলাবাহুল্য সফলও হয়েছেন অনেকাংশে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পর রামমোহন ও সংবাদপত্রের হাত ঘুরে গদ্যের মোটামুটি একটা রূপ বিদ্যাসাগরের হাতে এলো। মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যরস ও রামমোহনের প্রাঞ্জলতার স্পর্শ এতে থাকলেও গদ্য তখনও তার পূর্ণাঙ্গ রূপটি খুঁজে পায়নি। প্রমথনাথ বিশীর কথায় গদ্য তখনও তার গণ্ডীকে পেরিয়ে গদ্য সাহিত্য হয়ে উঠেনি। বিদ্যাসাগরের হাতেই এর সূত্রপাত। রামমোহন শব্দ সমন্বয় ও বাক্যবিন্যাসের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এবং প্রধানত যুক্তি তর্ক বিচার করেছেন বলে তাঁর ভাষা ও যুক্তি বুদ্ধিপ্রধান হয়ে উঠেছে। যুক্তিসর্বস্ব বলেই তা স্বভাবতই নীরস, সহজবোধ্য হয়েও তা উপভোগ্য ও সুখপাঠ্য হয়নি। বিদ্যাসাগরের গদ্যে দুরন্বয় দোষ, যা রামমোহন উপলব্ধি করেও দূর করতে সক্ষম হননি, তা লোপ পেয়েছে। শব্দবিন্যাসের দক্ষতায়, বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে, বাক্যের মধ্যে গতি সঞ্চারে সে যুগে বিদ্যাসাগর একক ও অনন্য। তাঁর হাতেই বাংলা গদ্য সমস্ত জড়তা কাটিয়ে স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়েছে এবং একালেই গদ্য বক্তব্যের সঙ্গে শিল্পীর কল্পনা ও ব্যক্তিত্বকে ধারণ করতে সক্ষম হল। তাঁর অনুবাদ ও মৌলিক সব রচনাতেই এর প্রমাণ মিলবে। কিন্তু তাঁর বেনামী রচনাগুলিতে যে প্রাণ-স্পন্দন ও অন্তরঙ্গ ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছে অন্যান্য রচনায় তার অভাব রয়েছে যথেষ্ট। 'অতি অল্প হইল', 'আবার

অতি অল্প হইল' ইত্যাদি রচনার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ ও স্মিত হাস্যের ছোঁয়ায় ভাষা সহজ, স্বাভাবিক ও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তাঁর গদ্যের ছন্দমাধুর্য ও অনুপ্রাসের খেলা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। সাধু ও চলিত গদ্যের দ্বন্দ্বে তিনি মধ্যপথ দেখালেন। শুরু হল সাহিত্যিক গদ্যের যুগ।

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহবিষয়ক রচনায় প্রযুক্ত গদ্য ও রচনারীতি চরিত্রানুযায়ী, এতে তারল্য বা অতিভাষণ নেই, আছে প্রতিপাদ্য বিষয় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ়তা, বাক্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য। তত্ত্ব বিচারে ও তথ্য প্রদানে এ ভাষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে এ ভাষার তীক্ষ্ণতা, তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়।

বিদ্যাসাগর তর্ক-বিতর্কমূলক প্রবন্ধের গদ্য সৃষ্টি করেছেন। বইগুলি সারগর্ভ যুক্তি সমেত রচনার নিকষস্থল'। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্রীয় বিচার করা এবং সেই বিচার সরল ভাষা সহযোগে, পাণ্ডিত্য সহকারে, সুন্দর প্রণালীতে জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করানোর মত অসাধ্য কর্ম সম্পন্ন করেছেন। রামমোহন এই জাতীয় রচনার পথ প্রদর্শক। কিন্তু তাঁর পুস্তকগুলি উক্তি প্রত্যুক্তি বা কথোপকথনের আকারে রচিত বলে বক্তব্য যুক্তি পরম্পরায় গ্রথিত হয়ে প্রবন্ধের 'দৃঢ় ও ঘন সংবদ্ধতা' রক্ষা করতে পারে নি। এদিক দিয়ে বিদ্যাসাগর অখণ্ড প্রবন্ধের আকারে বিতর্ক মূলক আলোচনার আদর্শ প্রবর্তন করেছেন বলা যায়।

বহু বিবাহ ও 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক' দুটিতে তত্ত্ব তথ্য ও কৌশল, বিনয় এবং যুক্তিতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিধবা বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকে, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চপতিতে পতৌ·····স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রী দিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। ····· নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে—এই বচনে স্বামীর অনুদ্দেশ হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি আছে, তাহা কোনও মতেই বাগ্‌দত্তা বিষয়ে সম্ভবিতে পারেনা। কারণ,

অনুদ্দেশ স্থলে, সন্তান হইলে একপ্রকার কালনিয়ম, আর সন্তান না হইলে আর একপ্রকার কালনিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। বাগদত্তা বিষয়ে এই বিবাহ বিধি হইলে সন্তান হওয়া না হওয়া এ কথার উল্লেখ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

এমনি ভাবে তথ্য ও যুক্তির সমন্বয় করেছেন বহু বিবাহ বিষয়ক পুস্তকেও—'সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধার্থঘ্ন্য প্রিয়ংবদা।

স্ত্রী প্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পূরুষদ্বেষিণী তথা॥

যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, চিররোগিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্র প্রসবিনী ও পতিদ্বেষিনী হয়, তৎসত্বে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবেক।

পূত্রলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সাধন গৃহাস্থশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য; পুত্রলাভ ব্যতিরেকে পিতৃঋণের পরিশোধ হয়না; যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য ব্যতিরেকে দেবঋণের পরিশোধ হয় না। স্ত্রী বন্ধ্যা…প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দার পরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। …নিমিত্ত না ঘটিলে পূর্বে পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক না এইরূপ নিষেধ ও প্রদর্শন করিয়াছেন।' এমনি মুক্তির পর যুক্তি সাজিয়েছেন, শাস্ত্রবাক্য উধৃত করেছেন। কোথাও বিভ্রান্ত হবার সুযোগ নেই, যুক্তিতে ফাঁকি নেই। কিন্তু শুধুই যুক্তি তর্ক নয় বিদ্যাসাগরের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ যুক্তিগুলিকে বলিষ্ঠতা দান করেছে। লাঞ্ছিত বঙ্গনারীর জন্য তাঁর দরদ, উৎকণ্ঠা, আকুলতা গ্রন্থদুটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। রামমোহনের মত এগুলি শুধুই তত্ত্ব ও তথ্যে ভারাক্রান্ত নয়। লেখকের হৃদয়কে যেন কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায় এর ভিতর। সামান্যতম ভাবে হলেও তাঁর প্রবন্ধ কিছুটা সাহিত্যধর্মী হয়ে উঠেছে। বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্পর্শ পেয়েছে। এসব গ্রন্থ রচনায় রামমোহন তার্কিক আর বিদ্যাসাগর যুক্তিনিপুণ প্রবন্ধকার। তবে বিশেষ একটি বিষয়কে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রন্ধগুলি লেখা বলে এগুলি সাহিত্যিক প্রবন্ধ হয়ে ওঠেনি—সে মর্যাদা তাদের দেওয়া যায় না। তবুও প্রবন্ধ রচনায়

বাক্যের ও বক্তব্যের যে শৃঙ্খলা প্রয়োজন বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধে তা পুরামাত্রায় রয়েছে। সর্বোপরি তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও ভাষার সুস্পষ্টতা প্রবন্ধগুলিকে পরবর্তী কালে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে আমাদের বিশ্বাস।

বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ ছাড়া বিদ্যাসাগরের অন্য মৌলিক প্রবন্ধ পুস্তক হচ্ছে সাহিত্য বিষয়ক একটি সমালোচনা। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) পুস্তকটি সংস্কৃত সহিত্যে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের জ্ঞানের প্রমাণ। তিনি অতি সংক্ষেপে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ধরণের কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, যেমন মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পূকাব্য, গদ্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য ইত্যাদি। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও স্পষ্ট ভাষায় নিরপেক্ষ ভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। এই সমালোচনার ভিতর দিয়ে কাব্যগুলির প্রাথমিক পরিচয় ও গুণাগুণ সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কাব্যগুলির শুধু গুণকীর্তনই করেননি, প্রতিটির দোষও তুলে ধরেছেন। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের অশ্লীলতা সম্বন্ধে তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন।

'রচনার মাধুর্য্য নাই, কথা যোজনার চাতুর্য্য নাই; অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার অসম্বদ্ধ কথা আছে··· ···গ্রন্থকর্ত্তা শিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আদিরস ঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালক দিগের নিমিত্ত নীতি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া কি বুঝিয়া গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন, বলিতে পারা যায়না।'

রস সাহিত্যের আনুগত্য তিনি সর্বসময় স্বীকার করেননি। বইটি বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার পথ প্রদর্শক তাই তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

তাছাড়া এই বইটির পেছনে (যদিও এটি বক্তৃতার জন্য লেখা) যে কারণ কাজ করেছে তা হচ্ছে, দেশবাসীকে সহজ সরল ভাষায় সংস্কৃত

সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছে। এখানে তাই পাণ্ডিত্য আর বিচার নৈপুণ্যই নেই, তাঁর সহৃদয় চিত্তের উপস্থিতিও লক্ষণীয়।

সন্দেহ নেই, যুক্তিমূলক প্রবন্ধ রচনারীতির প্রবর্তক রামমোহনই, তিনিই এদেশে স্বাধীন চিন্তাধারার দ্বার উন্মুক্ত করেন, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রবন্ধ গুলির মাধ্যমে সেই স্বাধীন চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেক দূর।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর দু'জনই যুগসৃষ্ট এবং যুগস্রষ্টা। কালের অন্তরস্থিত ধ্বনিকে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইংরেজ অধিষ্ঠিত বাংলায় রামমোহন তথা তৎকালীন অভিজাতরা ছিলেন শহর কেন্দ্রিক ও বানিজ্যিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠি। তবুও তারা পুরাতন সামন্তযুগীয় অভিজাতদের চাইতে অনেক প্রগতিশীল ছিলেন। জীবনটাকে ছকেবাঁধা মানবাতীত আধ্যাত্মিক বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির বিস্তৃত অঙ্গনে তার বিচার করেছিলেন। তাঁরা হিন্দুধর্মকে বাহ্য আচার সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিমানসের বুদ্ধি দীপ্ত অন্তর্লোকে অভিষিক্ত করতে এবং তার ভাবমাধুর্য ও মহিমাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সন্দেহ নেই, তাঁদের এই চাওয়া অনেক খানি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, তবুও শেষ পর্যন্ত তা ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ না থেকে সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নবাজাগরণ রূপে সঞ্চারিত হয়েছিল। রামমোহনের কণ্ঠ-উত্থিত নবযুগের বাণী আধুনিক কালের Humanism এর মর্মমূলে রস সঞ্চার করেছিল। ফলে আজও তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর 'দেবতা' রূপে জনমানসে দীপ্যমান।

রামমোহন-মানসের বুদ্ধি-প্রাধান্য ও মানবতাবাদ যদি জন্মগতও হয়ে থাকে তবু ইউরোপীয় মতাদর্শ তাতে জলসিঞ্চন না করলে তা কতটুকু কার্যকর হত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেও ঠিক একই কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর সমাজ সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার আন্দোলন কতটুকু সার্থক হত, যদি না তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও পটভূমি

প্রস্তুত করতেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল ও তৎকালীন যুগদর্শী শিক্ষিত পুরুষগণ। কাল ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল—আর নিজস্ব বুদ্ধিবাদ আর যুক্তিবাদের পূর্ণতা নিয়ে রামমোহন এবং পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর তাঁর অপরিসীম মানবপ্রেমকে পুঁজি করে আবির্ভূত হলেন। নিজেদের অখণ্ড ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাঁরা সৃষ্টি করলেন যুগ।

রামমোহনের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিচারশীলতার ইচ্ছাকে বিদ্যাসাগর পরিণতির পথে নিয়ে গেলেন। বিদ্রোহী ও যুক্তিবাদী রামমোহনের সাক্ষাৎ শিষ্য বিদ্যাসাগর। তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টায় প্রতীয়মান হয় যে, জনকল্যাণ ছিল দু'জনেরই জীবনের মূল ভিত্তি। নবযুগের নতুন প্রবৃত্তিগুলি তাঁদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এইযে তাঁদের চরিত্র ও মানসিকতায় বিরাট পার্থক্য, মিল দুর্লভ। তাঁরা দেশবাসীর জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন। রামমোহন এই মানবকল্যাণের বাণীটি অনুভব করেন বুদ্ধির যৌক্তিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে। যুক্তিবাদ থেকে তাঁর মানব হিতবাদ জন্মগ্রহণ করেছে। বিদ্যাসাগরের লোক-কল্যাণের মূলে আছে জীবের দুঃখ বেদনার প্রতি প্রবল আবেগ সঞ্জাত অমিত সহানুভূতি। তাঁর মানবপ্রেম যুক্তি-নিরপেক্ষ প্রবল আবেগ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর হৃদয়াবেগ যুক্তিবাদকে খর্ব করেছে। বিদ্যাসাগরের আবেদন মূলতঃ আবেগের নিকট, রামমোহনের আবেদন যুক্তির নিকট। এই স্থানেই দুই যুগপুরুষের প্রধান পার্থক্য।

রামমোহন ধর্ম নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন, কিন্তু তিনি ভক্তসাধক ছিলেন না। নীতির দিক দিয়েও তাঁর মনে কোন দৃঢ় বাঁধন ছিলনা। চাকরী জীবনে নির্বিচারে ঘুষ নিয়েছেন মদ খেয়েছেন, নিজের বাড়ীতে বাইজী নাচের ব্যবস্থা করেছেন।

বিদ্যাসাগর ধর্ম আলোচনা করেননি তবে তাঁর কাজ দেখে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোন গোঁড়ামী ছিল বলে মনে হয়না। ধর্ম ও নীতির অনুশাসন কে অতিক্রম করেও তিনি সর্বক্ষেত্রে জীবনের শুচিতা ও পবিত্রতা

রক্ষা করেছেন। মানুষের কাছে ব্রাহ্মণ সমাজের কলুষতার জন্য নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে অপমান বোধ করতেন, কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যে অহং-চেতনায়, আত্মসম্মান জ্ঞানে ফাটল ধরেনি কখনও। জীবনের সকলক্ষেত্রে সত্যই ছিল তাঁর জীবনের নিয়ামক। এমন সত্যনিষ্ঠ মানব-প্রেমিক সে যুগে ছিলনা, এ যুগেও বিরল।

রামমোহন বিদ্যাসাগরের মত দাতা ছিলেন না। অভিজাত্যের মঞ্চ থেকে উপদেশ দিতে হয়তো পারেন, সভা, সমিতি আর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। সমস্যা-সমাধানের পথও কিছু দেখিয়ে দিতে পেরেছেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত সমস্ত দুঃখীর সঙ্গে, ব্যথিতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করবার ক্ষমতা বা ইচ্ছে তাঁর ছিলনা। বিদ্যাসাগর নিজের জীবনে দারিদ্রের দাহ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সমস্ত দুঃখীর দুঃখ দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, তাঁদের কষ্ট তাঁকে তীব্র ভাবে আঘাত হানতো।

রামমোহন বিষয়ী পরিবারের বিষয়ী লোক, নিজ বুদ্ধিতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, শুধু নিজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই। বাবা, মা, ভাইয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি কখনই মাথা ঘামাননি, তাদের কষ্টে বিচলিত হননি। বলা যেতে পারে দারিদ্রকে তিনি এড়িয়ে গেছেন সারাজীবন। পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগর দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিদ্যা ও পরিশ্রমের জোরে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর মা, বাবা, ভাই, আত্মীয় পরিজন। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসা। নিজের প্রতিষ্ঠাই নয়, ভাই বন্ধু পরিচিত সবার জন্যেই তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকতেন। রামমোহনের মত বিশ্বের বৃহত্তম সীমায় উত্তরণ বা বিশ্ববাসীর সঙ্গে এক হবার বাসনা তাঁর ছিল না, নিজের সঙ্কীর্ণ সীমায় সুখ আনতে অনাচার দূর করতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন সারাজীবন।

তাই বিদ্যাসাগরের বাবা-মা যেখানে শেষ জীবনে ছেলের সেবা-যত্নে

তৃপ্ত হয়েছেন, ছেলের কাছে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার শ্রদ্ধা ভক্তি পেয়েছেন; সেখানে রামমোহনের অতুল ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও বাবা মরেছেন জেল খেটে, আর মায়ের শেষ জীবন কেটেছে মন্দির ঝাড়ু দিয়ে। এসব কথা চিন্তা করলে রামমোহনের জনকল্যাণ বা সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার মূল্য অনেক কমে যায়। তাঁকে দেবত্বের আসনে বসাবার যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না। বিদ্যাসাগরের কাজে কোন আড়ম্বর ছিলনা, নীরবে নিরলস ভাবে তিনি দেশবাসীর এবং সমাজের জন্যে, সাহিত্যের উন্নতির জন্যে কাজ করে গেছেন। ফলে তাঁর কাজের যথার্থ মূল্যায়ন সময়ে হয়নি।

তবে একটি কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর দু'জনই শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এবং এই শক্তির জোরেই তাঁরা সেই কালরাত্রির অন্ধকারে আলোর দীপশিখা জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মে যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত তাতে পার্থক্য খুব নেই। দেশবাসীর চিত্তকে তাঁরা সমান ভাবেই নাড়া দিয়ে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের বৈপ্লবিক ভাবধারায় মন ও মানস পুষ্ট এবং তাদের আন্দোলনে অঙ্গীভূত ছিলেন বলেই বোধ হয় বিদ্যাসাগরের আন্দোলন এত তীব্র ও উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল। রামমোহনের সমাজসংস্কার ও শিক্ষার উন্নতি চেষ্টা (তা সে যে উদ্দেশ্যেই হোক) বিদ্যাসাগরে বিস্তৃতি ও ক্রমপরিণতির পথে এগিয়েছে। তাঁরা দেশবাসীকে উদার মুক্ত জীবনের দিকে আহ্বান করেছিলেন। তাই বলা যেতে পারে, উনিশ শতকে বাঙালীর মানস-চেতনা জাগ্রত করবার প্রশ্নে তাঁদের স্থান পাশাপাশি।

প্রাবন্ধিক রামমোহনে প্রবন্ধ রচনার যে সূত্রপাত, বিদ্যাসাগরে সেটা পূর্ণরূপ না পেলেও তা যে পূর্ণতার পথ নির্দেশ করেছে সে কথা অনস্বীকার্য।

সহায়ক গ্রন্থ

১ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, **সাহিত্য-সাধক চরিতমালা**—১৬ ও ১৮ সংখ্যা, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পঞ্চম সং, ১৩৬২ সাল।

২ বিনয় ঘোষ, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, ১ম ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৪ ও ১৩৬৭।

৩ মণিবাগচি, **বিদ্যাসাগর**, কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৩৫৭।

৪ ন্যায়রত্ন, রামগতি, **বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব**।

৫ বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র, **বিদ্যাসাগর চরিত ও ভ্রম নিরাশ**, কলিকাতা; বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।

৬ শ্রী প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, **বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক**, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৭।

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **চারিত্র পূজা**, ৩য় সং, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫২। 'রাজা রামমোহন রায়,' 'বিদ্যাসাগর' শীর্ষক প্রবন্ধ।

৮ দাসগুপ্ত, শশিভূষণ, **বাংলা গদ্যের একদিক**, ৩য় সং কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৬৭।

৯ রায়, কালিদাস, **সাহিত্য পরিচয়**, ২য় সং, কলিকাতা, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ১৩৩৭।

১০ বন্দোপাধ্যায়, অসিত কুমার, **উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য**, কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯।

১১ বিনয় ঘোষ, সম্পাদিত, **সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র**, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩।

১২ পোদ্দার, অরবিন্দ, **উনবিংশ শতাব্দীর পথিক**, কলিকাতা, ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ১৯৫৫।

১৩ সিংহরায়, জীবেন্দ্র, **সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ**, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬৬।

১৪ মজুমদার, মোহিতলাল, **বাংলা নবযুগ**, কলিকাতা, ১৮৭৯।

১৫ ত্রিপুরাশংকর, **উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য**।

১৬ কাজী, আবদুল ওদুদ, **বাংলার জাগরণ**, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩।

১৭ শাস্ত্রী, শিবনাথ, **রামতনু লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, কলিকাতা, নিউ এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৬২।

১৮ হালদার, গোপাল, **বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা**, ২য় খণ্ড কলিকাতা, মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৫।

১৯ গুপ্ত, সুশীল কুমার, **উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার নবজাগরণ**, কলিকাতা, মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিডেট, ১৯৫৯।

২০ দে, অধীর, **বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা**, কলিকাতা, সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৯৬২।

২১ Marshman, istory of Serampore Mission.

২২ মিত্র, শিবরতন, **মোহন-সুধা**, কলিকাতা।

২৩ বসু, রাজনারায়ণ, **আত্মচরিত**, কলিকাতা, তৃয় সং, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ১৯৫২।

২৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর, সম্পাদিত, **প্যারীচাঁদ রচনাবলী**, ঢাকা, কথাকলি, ১৯৬৮।

২৫ ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, **রামমোহন গ্রন্থাবলী**, কলিকাতা, সাহিত্য পরিষৎ সং, ১৯৫১।